সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম

নারায়ণ সান্যাল

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

কৈফিয়ৎ

'দেবদাসী'-প্রথা বর্তমানে নেই—অন্তত খাতা-কলমে। আইনের সাহায্যে মন্দির কারাগার থেকে তাদের মুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সহস্রকের এই কু-প্রথাটি বর্তমান শতাব্দীতে আইন-মোতাবেক নিষিদ্ধ হয়েছে। সেদিন সারা ভারতে সে কী উল্লাস। আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ছোটখাটো সংস্করণ যেন। ভারতকে স্বাধীন করায় যেমন জবাহরলালকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, এই ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নায়িকা ডক্টর মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিকে তেমনি 'পদ্মভূষণ' খেতাব দেওয়া হয়েছিল। সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

কিন্তু।

ভারত স্বাধীন হওয়ায় গোটা দেশটা যেমন মুক্তির স্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল—অন্নবস্ত্র-শিক্ষা-নিরাপত্তার অভাব যেমন আমরা আজ আদৌ অনুভব করি না, মন্দিরের চার-দেওয়ালের রুদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ দেবদাসীরাও কি তেমনিভাবে সব কিছু ফিরে পেল?

—সম্মান, মর্যাদা? স্বামী-সংসার-সন্তান?

ঠিক জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। প্রশ্নটা আপাতত মগজে একটা যন্ত্রণার উদ্রেক করেছে; মনে হচ্ছে এ গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল : 'সুতনুকা এখন আর দেবদাসী নয়'—বা ঐ জাতীয় কিছু। আপাতত অতীত ইতিহাস হাতড়ে যেটুকু পেয়েছি তাই পরিবেশন করি। মুক্ত দেবদাসীদের সন্ধান পেলে আপনাদের জানাবো।

নানান গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে , যা গ্রন্থ-শেষের নির্দেশিকায় উল্লেখ করে পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি।

এ কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে উনিশ শ' তিরাশির পূজা-সংখ্যা যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল।

নারায়ণ স্যান্যাল

চৈত্র শেষ ১৩/৪/৮৫

এক

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুতনুকা শুধু 'একটি দেবদাসীর নাম' নয়, সুতনুকা ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম দেবদাসী। 'দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা নারী' —দেবদাসী বলতে যা বুঝি, তা আগে থেকেই ছিল, অনেক অনেক আগেকার যুগ থেকে ; কিন্তু 'দেবদাসী' শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে সুতনুকার ঐ সুতনু ঘিরেই। তার কাহিনীই আপনাদের আজ শোনাতে বসেছি।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? আমার তথ্যের ভাঁড়ে ভবানী। কিছুই জানি না তার বিষয়ে। নামটা যদি সার্থক হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় তার তনুদেহের প্রতিটি অঙ্গে থরে থরে সৌন্দর্যসম্পদ সঞ্চিত করেছিলেন পঞ্চশর। নামটা নিশ্চয় সার্থক। অজন্তা-কোনার্ক -মহাবলীপুরমের অনেক অনেক নায়িকার মূর্তি মনের চোখে ভেসে ওঠে ঐ নামটা শুনলে— তন্বী, মধ্যক্ষাম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। আমার পুঁজি মাগধী প্রাকৃতে রচিত একটি শ্লোক আর তার নিচে সরল গদ্যভাষে একটি স্বীকৃতি। ব্যস, ঐটুকুই আমার সম্বল, কাহিনীর উপাদান। 'ব্লাইন্ড' খেলব না আপনাদের সঙ্গে। প্রথমেই হাতের তাসটা টেবিলে বিছিয়ে দিই:

মধ্যপ্রদেশে সরগুজা রাজ্যে অনুচ্চ রামগড় পাহাড়। পাশাপাশি দুটি অকৃত্রিম পর্বতগুহা—যোগীমারা আর সীতাবেঙা; কে বা কারা কোন্ যুগে ঐ অকৃত্রিম পর্বত গুহাকে ছেনি হাতুড়ির শাসনে গুহামন্দিরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল তা জানি না। ভগ্নস্তূপ দেখে মনে হয় বৌদ্ধ-গুহা নয়, অর্থাৎ ভাজা-কান্হেরী-অজন্তা-নাসিক-এর সমগোত্রীয় নয়; ও দুটি পৌরাণিক হিন্দু মন্দির। কিন্তু রূপদক্ষের দল বৌদ্ধ শিল্পসৌকর্যে অভ্যস্ত। পাহাড়ের গায়ে 'বাস-রিলিফ'-এ (অর্ধ-উৎকীর্ণ প্রস্তর) যে ভাস্কর্য—মহাকালের পরুষ হস্তাবলেপনে ক্ষতবিক্ষত মূর্তিগুলি—ভারহূত-সাঁচীর ঢঙে। সেই বংশীবাদিকা-বীণারঞ্জিনী-নৃত্যরতা অপ্সরা-গন্ধর্ব দেবদাসীর দল। উপরের খিলানে দুর্বোধ্য হরফে কী-যেন লেখা। পণ্ডিতেরা তাই নিয়ে যুগে যুগে তর্কবিতর্ক করেছেন। ভারততত্ত্বের স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যাসম[১] শ্লোকটির ইংরেজী তর্জমা করেছেন:

> "Poets, the leaders of Lovers,
> Light up hearts which are
> Heavy with passion,
> She who rides on a seesaw,
> The object of jest and blame,
> How can she have fallen so deep in love
> As this?"

অনুবাদে যা দাঁড়ায় ঃ

কবি, নগর-নাগর-নৃপতি
জ্বালিয়ে তোলে অন্তর, নিরন্তর রিরংসা-জর্জরিত।
কৌতুক-কর্দম-ক্লিশিত ঐ যে মেয়েটিকে
নাগরদোলায় দোলায়
ও কেমন করে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়
এমন গভীর —সুগভীর প্রেমে?

এবং তারপরেই সহজ সরল গদ্যভাষে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : 'সুতনুকা নাম দেবদাসিক্কী তং কাময়িত্থ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদক্খে।'

তার অর্থ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এম. বয়ার তার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন " Sutanuka by name, Devadasi. The excellent among young men loved her, Devadinna by name, skilled in sculpture" টি. ব্লচ-এর মতে আক্ষরিক অনুবাদটা হওয়া উচিত : Sutanuka, by name, a Devadasi made this resting place for girls. Devadinna by name, skilled in painting." দ্বিতীয় অনুবাদটা কিছুতেই মানা চলে না। —'কাময়িত্থ' শব্দটির অনুবাদ না থাকায়। ব্যাসম নিজে ঐ পংক্তিটি অনুবাদের চেষ্টা করেননি; তাঁর মহাগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট: "Sutanuka, the slave-girl of the gods, loved the excellent young man Devadinna, the artist." অর্থাৎ সুতনুকা নামের জনৈকা দেবদাসী তরুণ শিল্পীচূড়ামণি দেবদিন্নকে ভালবেসেছিল।

ব্যস্। এটুকুই আমার পুঁজি।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? বয়ার সাহেবের মতে দেবদিন্ন সুতনুকার প্রেমে পড়েছিল, অথচ পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে সুতনুকা দেবাদিন্নের প্রেমে পড়েছিল। কোন্‌টা সত্য? জানি মশাই জানি, আপনি যা বলতে চাইছেন সেটাও ভেবে দেখেছি আমি —খঞ্জনী যখন বাজে তখন একা বাজে না, কে কাকে বাজায়, এ প্রশ্নটাই বাহুল্য। ওরা একে অপরের স্পর্শে রোমাঞ্চিততনু হয়। সেই কম্পনই যখন শব্দতরঙ্গে তোমার-আমার শ্রুতিতে ধরা দেয় তখন আমরা বলি—খঞ্জনী বাজছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? 'প্রেমে পড়া' আর 'প্রেম লাভ করা'—প্রেমের দুনিয়ার কর্তৃবাচ্য -কর্মবাচ্য কি একই মুদ্রার 'হেড অর টেইল'? মূল্যমানের তাতে হেরফের হয় না? আমি কিন্তু তা মানতে রাজি নই। দেবদাসী ক্ষণিকবাদী, প্রেমজীবিনী — তাকে প্রহরে-প্রহরে প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়, সেটাই তার পেশা। প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন নাগর। অভ্যাসবশে অজানা অচেনা পুরুষকে সে সন্ধ্যারাত্রে তুলে নেয় হাতে, মধ্যরাত্রে মুক্তগ্রন্থী নীবিবন্ধের মেখলায় অভ্যাসবশেই তাকে স্পর্শ করায়,

ভোর রাতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অভ্যস্ত অবজ্ঞায় 'পরশপাথর' খুঁজে ফেরা খ্যাপার মতো। তারপর বর্ষণমুখর কোন এক নির্জন নিশীথে যদি সেই অলসকন্যার নজরে হঠাৎ ধরা পড়ে—কটিবন্ধে নিকষিত হেমের স্বর্ণাভা, তখন সে কী করবে? কেমন করে খুঁজে পাবে সেই অবজ্ঞায়-ছুঁড়ে-ফেলা পরশ পাথর? তাই তার জীবনে অনেক—অনেক বড় জাতের প্রাপ্তি, যদি সে তার মুঠিতে ধরতে পারে তরুণ শিল্পীর একান্ত প্রেমকে!

তা সে যাইহোক, সুতনুকার কাহিনী লিখতে বসে উপাদান পেয়েছি ঐটুকুই। স্থান-কাল-পাত্র চিহ্নিত; তার বেশী কোনও তথ্য নেই। তথ্য থাক না থাক, সত্য আছে। ঐ অজ্ঞাত কবির শ্লোকার্ধটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

কবি বলেছেন, মেয়েটি নাগরদোলায় দোলে। উভয় অর্থেই। চক্রাবর্তনের পথে কখনও উঠে যায় উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শীর্ষবিন্দুতে—আদরে সোহাগে 'কমপ্লিমেন্টস' -এ সে তখন প্রাপ্তির সপ্তমস্বর্গে;তখন সে নগর-নাগর-নৃপতিদের লালসাজর্জর কামনার ধন। কবি তখন তার রূপবর্ণনায় অভিধান হাতড়াতে ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের[2] মূল্যায়নে তখন সে নৃপতি-শ্রেষ্ঠী-মহাপণ্ডিতদের সমপংক্তিতে উপবিষ্টা হবার মর্যাদাসম্পন্না।

কিন্তু তারপর? নাগরদোলার সেই শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকবাদিনী স্থাবর নয়। পরমুহূর্তেই শুরু হয় তার অধঃপতন। নামতে-নামতে-নামতে সে এসে উপনীত হয় সমাজের নিম্নতম 'নাদির'-এ। তখন সে শুধু কৌতুকের শিকার, কর্দমপঙ্কে ক্লেদাক্ততনু। জেরুসালেম অধিবাসীদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়—কে ঐ ভ্রষ্টা রমণীকে লোষ্ট্রাঘাতে প্রথম ভূতলশায়িনী করবে!

এমন একটি বিচিত্র মেয়ে কেমন করে পড়ে অমন প্রেমে? অমন গভীর—সুগভীর প্রেমে? জানি না। ইতিহাস জানে না। তবে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমাকে যদি ছাড়পত্র দেন, তাহলে কল্পনায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে পারি: রূপদক্ষ দেবদিন্নের প্রভায় প্রোজ্জ্বল সুতনুকার প্রেমকাহিনী।

কিন্তু তার আগে জেনে নিতে হবে— 'দেবদাসী' কে? 'নাগর দোল' কী? এবং 'দেবদিন্ন' কেন?

'দেবদাসী' প্রথার মূলে প্রবেশ করতে হলে আমাদের জানা দরকার 'পতিতাবৃত্তি' -র আদিকথা। কারণ দেবদাসী বাস্তবিকপক্ষে পতিতারই এক শর্করামণ্ডিত সংস্করণ। এবং প্রসঙ্গত : দাসপ্রথা ; যেহেতু 'দেবদাসী' ঐ দাসপ্রথারও এক বিচিত্র রূপান্তর।

দাসপ্রথা এসেছে ইতিহাসের উষামুহূর্তে। মানুষ যেদিন শিকার ও ফলমূল আহরণ ছেড়ে জমি চাষ করতে শিখল, যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে গড়ে তুলল জনপদ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজপুরোহিত-তন্ত্র, তখন থেকেই দাসপ্রথার শুরু। বিজয়ী জনপদনৃপতি

বিজিত রাজ্যের মানুষকে নিয়োগ করলেন দাসরূপে—পুরুষকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে এবং নারীকে বিনা-প্রতিবাদে দেহদানে বাধ্য করা হল।

সময়ের মাপকাঠিতে পতিতাবৃত্তি বোধকরি দাসবৃত্তির চেয়ে প্রাচীন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলছেন, "কোনও কোনও প্রাক-মানব জীবকে (primates) যৌনতা বহির্ভূত প্রয়োজনে (non-sexual purposes) যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখা যায়। স্ত্রী-শিম্পাঞ্জী বা স্ত্রী-বেবুনকে দেখা গেছে খাদ্যের প্রয়োজনে পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। দেহদানে পুরুষকে সন্তুষ্ট করার পর পুরুষ যখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকে তখন পুরুষজন্তুর সংগৃহীত খাদ্যে সে ভাগ বসায়। সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে আহার্য সংগ্রহ মানসে (যা নাকি পতিতাবৃত্তির মৌল প্রেরণা) দেহদানের প্রচেষ্টা 'মানুষ' নামক জীবের চেয়ে প্রাচীন—প্রাক্‌মানব-জীবদের ঐতিহ্যবাহী।"[3]

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। মানবেতিহাসের একেবারে উষা যুগ থেকেই বিভিন্ন সভ্যতায় ঐ দেবদাসীপ্রথার নানান রকমফের দেখা যায়। এবং আরও বিস্ময়ের কথা, সে-প্রথা রাজতন্ত্র-ঘেঁষা, নয়, পুরোহিত-তন্ত্র ঘেঁষা। রাজার প্রাসাদে সর্বদা-দেহদানে-প্রস্তুত উপপত্নী, দাসী বা গণিকা অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু মন্দিরে তারা এল কেমন করে? কেন? একটি সভ্যতায় নয়; প্রাচীনকালের প্রায় প্রত্যেকটি সভ্যতায়। আর চূড়ান্ত বিস্ময়—তারা পতিতা নয়!!

কারণ 'পতিতা' শব্দটার আভিধানিক[4] অর্থ : 'অর্থের বিনিময়ে যে দেহদান ব্যবসায়ে লিপ্ত।' এরা পতিতা নয় তিনটি যুক্তিতে। প্রথমত : এরা অর্থের বিনিময়ে মন্দিরে গিয়ে দেহদান করত না ; দ্বিতীয়ত : এরা সামাজিক বিধান মেনেই মন্দিরে সমবেত হত এবং সর্বোপরি, মন্দির থেকে দেহদান করে বেরিয়ে এসে এরা নির্বিবাদে সমাজে মিশে যেত—কারও স্ত্রী, কারও বা মা হয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করত। সর্বস্তরের স্ত্রীলোকই।

এই প্রাচীনতম প্রথার তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম প্রথায়, যৌবনোদ্গমের পর কুমারী অবস্থায় তাদের মন্দিরে যেতে হত আদিরসের প্রথম পাঠ নিতে—মাত্র এক রাতের জন্য। দ্বিতীয় প্রথায়, তাদের মন্দির চত্বরে বেশ কিছুদিন যৌনজীবনের আদি পাঠ নিয়ে অভ্যস্ত হতে হত —কোথাও কয়েক সপ্তাহ, কোথাও বা কয়েক মাস। দুটি ক্ষেত্রেই মন্দির থেকে ফিরে এসে তারা বিবাহ করত, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-করণা করত। কেউ আপত্তি করত না। কারণ ব্যবস্থাটা ছিল সার্বজনীন। আজকের সতীত্বের ধারণায় সেই সমাজের মানসিকতাটা প্রণিধান করা শক্ত। একটা তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সহায়ক হতে পারে। পশ্চিমখণ্ডে 'ডেটিং' একটা স্বীকৃত প্রথা। বয়ঃপ্রাপ্তা হলে মেয়েরা পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণে যায়, ফিরে আসে রাত করে। নির্জনে তারা কী করে কেউ জানতে চায় না। শুনেছি, সে দেশে মায়েরা

এই পর্যায়ে মেয়েদের 'পিল' খেতে শেখায়। ফলে, এই সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থাটা সেখানে স্বীকৃত। ভারতীয় সমাজ অতটা অগ্রসর—বরং বলি 'অতি আধুনিক' নয়। এখানে অন্য জাতের তুলনামূলক উদাহরণ দেওয়া চলে। আমাদের সমাজে, স্ত্রীকে কোনও গাইনকলজিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ পরপুরুষে দেখেছে বলে কোন স্বামীই ক্ষুব্ধ হয় না, স্ত্রীও লজ্জায় মুখ লুকায় না।

তৃতীয় প্রথায়, কুমারী মন্দিরে যায়, আর ফিরে আসে না। সারাজীবনের জন্য দেবদাসী হয়ে যায়।

প্রথম প্রথাটির প্রাচীনতম নিদর্শন হেরোডোটাস[5]-এর বর্ণনায়। ব্যাবিলনের মিতিল্লা-মন্দির প্রসঙ্গে ইতিহাসকার লিপিবদ্ধ করেছেন— "ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে একটা লজ্জাকর প্রথা আছে। ব্যাবিলনের প্রতিটি রমণীকে জীবনে একবার অন্তত (রতি) মন্দিরে উপস্থিত হতে হবে এবং মন্দিরের অলিন্দে সার দিয়ে বসতে হবে। অজানা অচেনা পুরুষদল ঐ অলিন্দ দিয়ে পদচারণা করবার অবকাশে রমণীদের ভিতর এক-একজনকে পছন্দ করে তার কোলে একটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দেবে। কে দিল, তা ফিরে দেখবার অধিকার মেয়েটির নেই। যে তাকে পছন্দ করল তার হাত ধরে মেয়েটিকে চলে যেতে হবে মন্দির-চত্বরের বাহিরে নিভৃত-নিকুঞ্জে। সেখানে সেই অপরিচিতকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই মেয়েটি রতিদেবীর প্রাপ্য অর্ঘ্য মিটিয়ে দেবে। তারপর সে ফিরে যাবে নিজের সংসারে—সংসারধর্ম করতে। ঐ প্রথম রাতের পর আর কোনভাবেই মেয়েটিকে সতীত্ব থেকে টলানো যাবে না।"[6]

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ খোলাখুলি বলেননি—ব্যাবিলনের রমণী কি কুমারী অবস্থায় রতি-মন্দিরে আসত, অথবা জীবনের যে কোন পর্যায়ে। কিন্তু ফিনিশীয় সভ্যতার হেলিওপোলিস্-এর মন্দিরে সমবেত হত শুধুমাত্র অক্ষতযোনি কুমারীর দল : তারা তাদের কৌমার্যদান করে বিবাহিত জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করত[7]। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলে সিরিয়ার রতি-মন্দিরে এই প্রথা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের প্রারম্ভে কন্সতান্তাইন সেই রতি-মন্দিরটি ভূমিস্যাৎ করে সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করিয়ে এ প্রথা আইনত রদ করিয়েছিলেন।[8]

লিডিয়ার রতি-মন্দিরেও কুমারীবলির প্রথা বিদ্যমান ছিল— কিন্তু সেখানেও সেটা ছিল এক-রজনীর দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু আর্মেনিয়া অথবা পারস্যে এক রাতে মজুরি মেটানো যেত না। হতভাগিনীদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল সেখানে দেবদাসীর ভূমিকায় বন্দিনী হয়ে থাকতে হত। একাধিক পুরুষ কর্তৃক দীর্ঘকাল ধর্ষিতা না হলে তার মুক্তি নেই! "সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং রাজা-রাজড়ার দলও নিজ নিজ কন্যাকে ঐ রতি-মন্দিরে প্রেরণ করতে বাধ্য ছিলেন। সেখানে একাধিক অপরিচিত পুরুষকে দেহদানে ধন্য করে

স্ত্রীলোকেরা পুরোহিতের অনুমতিপত্র হাতে নিজ নিজ পরিবারে ফিরে আসতেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের বিবাহ হত এবং ঐ দৈহিক দেবপূজার জন্যে কেউ তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতেন না।[৪]"

সিরিয়ার তাম্মুজ-মন্দিরে ছিল এই প্রথার এক অদ্ভুত রকমফের। সেখানে এক লৌকিক দেবতার উপকথা আশ্রিত মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম ঘিরে একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হত বসন্তকালে। উপকথার সারাংশটি এই রকম : পাতা-ঝরার দিনে পৃথিবীর মৃত্যু হয় ;—'Autumn, a Dirge'—দেব তাম্মুজ ভূতলশায়ী হন, তাঁর বার্ষিক মৃত্যু হয়। কিন্তু তখনই ঘটে বসন্তের শুভাগমন। বিরলপত্র বৃক্ষে দেখা দেয় কিশলয়—ফলের বাহার অন্তরাল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। প্রেমের স্পর্শে মৃতদেহে হয় নবজীবনের সঞ্চার। মদনোৎসবের ঐ চিহ্নিত দিনে নাগরিকার দল সমবেত হয় মন্দির চত্বরে। তারা বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকে। তারপর কে যেন হেঁকে ওঠে : তাম্মুজ জীবিত! ঐ তো তিনি। তাঁকে বুকে টেনে নাও—

রোদনক্লান্তা রমণীর দল কান্না ভুলে ছুটে আসে—ধরা দেয় অপেক্ষমান পুরুষদের কবাটবক্ষে। বাস্তবে সামাজিক শাসনকে বছরে একদিন শিথিল করা হয় মাত্র। এই উৎসবের একটি রকমফের মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মদনোৎসবের মধ্যে বিধৃত হয়েছিল বলে শরদিন্দু বর্ণনা করেছেন —"মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে....একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই— লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে.....পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্তিত নিচোলের কর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত, নির্লজ্জ উন্মুক্তভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।"[9]

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ফিনিশীয় এবং কার্থেজ সভ্যতাতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানেও সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের কন্যাদের (রতি-) দেবীর মন্দিরে প্রেরণ করত। স্বামীর অঙ্কশায়িনী হবার পূর্বে তাদের হতে হত অজানা অযুত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী।[10]

আশা করা স্বাভাবিক যে, এই প্রথার কোন একটি উৎস ছিল এবং তা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সভ্যতায় সংক্রামিত হয়েছে—বণিক, পর্যটক, রাজপ্রতিনিধি বা দিগ্বিজয়ীদের কল্যাণে। কিন্তু এটাই যে ধ্রুব সত্য তা না-ও হতে পারে। কয়েকজন পণ্ডিত যুক্তি-

তর্ক দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, একই জাতের প্রথা বিভিন্ন সমাজে উদ্ভূত হয়েছে পরস্পরের সাহায্য ছাড়াই—হয়তো একই অন্তর্লীন প্রেরণার উৎসমুখ থেকে। সে যুগের প্রতিটি সভ্যতাতেই আছেন এক-একজন প্রেমের দেবতা ও দেবী। শুধু প্রেমের নয়, রতিরঙ্গ-রসের! মদন ও রতি। ব্যাবিলনে তাম্মুজ-ইশতার, গ্রীসে ডায়োনিশাস্-আফ্রোদিতে, রোমক সভ্যতায় ব্যাক্কাস্-ভেনাস। ঐ যৌন-তথা-মদিরা উৎসবের হেতু নির্ণয়ে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে দেবদাসীপ্রথার মূল কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের যুক্তিতর্ক ঘেঁটে আমি ছয়টি মৌল হেতুর সন্ধান পেয়েছি। তাদের আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

১। **ধর্মীয় প্রেরণা** :

ক. উর্বরতাচার

খ. বলিদান প্রথা-ভিত্তিক

গ. কুমারী-তত্ত্ব

২। **সমাজনৈতিক প্রেরণা** :

ক. যৌথ যৌনাচারের উত্তরাধিকার

খ. আতিথেয়তার ফলশ্রুতি

গ. পুরোহিত-তন্ত্রের ব্যভিচার

একে একে তৌল করে দেখা যাক :

১। **ধর্মীয় প্রেরণা** :

ক. উর্বরতাচার : উর্বরতার বিষয়ে নানান লোকাচার সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে লক্ষ্য করা গেছে। লিঙ্গপূজা ও মাতৃতন্ত্র মানুষের আদিম ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। লিঙ্গ ও যোনি-প্রতীকী পোড়ামাটির নানান লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকেই পাওয়া গেছে—কুল্লি, যোয়াব অথবা হড়প্পা সভ্যতায়।[11]

প্রজনন-তন্ত্রের আদিম প্রেরণাটিকে মানুষ সঙ্গোপন করেছে। সেই গোপনীয়তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশ্রিত হয়েছে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতূহল। প্রকৃতির যা কিছু চমকপ্রদ তাতেই সে তখন দেবত্ব আরোপ করছে—সূর্য-চন্দ্র-পবন-অগ্নি সবই দেবত্বমণ্ডিত। জীবজগতের সঙ্গে মনুষ্যসভ্যতার মৌল পার্থক্য এই প্রজনন-তত্ত্বে—যৌনক্রিয়াকে সঙ্গোপনে রাখার নির্দেশ। ফলে তাতেও আরোপ করা হল দেবত্ব। যেহেতু এ তত্ত্বের দ্বৈতস্বরূপ আবশ্যিক, তাই শুধু দেব নয় এলেন দেবীও। হড়প্পা-সভ্যতায় প্রাপ্ত প্রোটোশিব-এর বিবর্তনে এলেন গৌরীপট্টবিধৃত শিবলিঙ্গ, অন্যান্য সভ্যতায় তাম্মুজ-ইশতার, ডায়োনিশাস-আফ্রোদিতে, ব্যাক্কাস-ভেনাস্। একজাতের পণ্ডিতের বক্তব্য—এই দেবদেবীর পূজার নৈবেদ্য হচ্ছে কুমারী নারীর আত্মদান। এ থেকেই এ প্রথার জন্ম।

এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য আপাতত অনুক্ত রেখে যাচ্ছি—কীভাবে 'ম্যাডোনা' রূপান্তরিতা হলেন 'ভেনাস'-এ। কারণ সেটা সুতনুকার নয়, দেবদিন্নর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শিল্পের অনুভাবনার সে বিবর্তন আপাতত উহ্য থাক, কারণ আমরা আছি—ভাস্কর্যের নয়, তার মডেল-এর প্রসঙ্গে।

খ. বলিদান প্রথা : প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ যখন নব্যপ্রস্তর যুগের উত্তরণে অপেক্ষমান, যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে যখন সে কৃষিনির্ভর হতে চাইছে, গৃহপালিত পশুর প্রবর্তন করছে ; সেই আদিম যুগে উদ্ভূত হয়েছিল 'বলি'-প্রথা। বলিদান প্রথা শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিভিন্ন সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া ও আজ্‌তেক সভ্যতায় তা অতি বীভৎস আকার ধারণ করে। দেবতাকে তুষ্ট করতে হলে কোন কিছু বলি দিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এ-প্রথার মূলে আছে প্রাক্‌মানব জীবদের সময় থেকে প্রচলিত বিনিময় প্রথা। প্রাচীন প্রস্তরযুগের কোনও প্রায়মানব প্রতিবেশীর শিকারে ভাগ বসাতে চাইলে বিনিময়ে তাকে দিতে হত কোন কিছু—হয়তো পাথরের একটি শাণিত ফলা অথবা জন্তুর চামড়া। স্ত্রীলোকে খাদ্যের বিনিময়ে যে দেহদান করত এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এমনকি পুরুষ তার অধিকারভুক্ত নারীদেহ—স্ত্রী ও কন্যার দেহ—খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বিনিময় পণ্য হিসাবে দেখত—অর্থাৎ যে-যুগে স্ত্রী ও কন্যার সংজ্ঞা চিহ্নিত হয়েছে। হয়তো সেই আদিম বিনিময়ের প্রেরণা থেকেই সভ্যতার উষাযুগে—সুমেরীয়, মিশরীয়, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় মানুষ স্থির করেছিল, বংশরক্ষার প্রয়োজনে দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করার পূর্বে বিনিময় প্রথায় দেবতাকে দিতে হবে স্ত্রী ও কন্যার দেহ।

গ. কুমারী-তত্ত্ব : কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই অদ্ভুত প্রথার প্রচলন গোষ্টি-সচেতনতা থেকে। এক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ যাতে পরস্পরের মধ্যে মারামারি না করতে পারে সে-বিষয়ে গোষ্ঠীপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অন্তর্কলহের পরিণতি হিসাবে কেউ যদি স্বগোষ্ঠীর কারও রক্তপাত ঘটায় তবে তার কঠিন শাস্তি হত। এ কানুন অতি আদিম যুগ থেকে বহাল—যখন মানুষ প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত হতে শিখছে, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পথ খুঁজছে।

স্যালমন রাইনাচ বলছেন [12], "নরনারীর প্রথম যৌনমিলনে নারীঅঙ্গের কিছুটা রক্তপাত অনিবার্য ; তাই মানুষ সেই আদিম যুগেই স্থির করল: স্বগোত্রের নরনারীর বিবাহ অবিধেয়। যদিচ এ রক্তপাত কলহ-দ্বন্দ্বের পরিণতি নয়, কোমলাঙ্গীর কাম্য, তবু বাহ্যত এ কাজ সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এ থেকেই স্বগোত্র বিবাহ হল নিষিদ্ধ।" স্বগোত্র ও স্বগোষ্ঠীর এই ধারণাটা ভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বললেন, "বাপু হে, স্বজাতির মধ্যে বিবাহে তোমাদের আপত্তি ঐ প্রথম রাত্রির রক্তপাতের জন্য তো? বেশ তো শুধু সেইটুকু দায়িত্ব ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্তের কাউকে দিলেই হয়।" একদল পণ্ডিতের মতে এইটিই বিভিন্ন সভ্যতায় রতিমন্দিরে কুমারী কন্যাদের প্রেরণের প্রেরণা। অর্থাৎ প্রথম রক্তক্ষরণের অপরাধ ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্তের স্কন্ধে চাপানো। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে একস্থলে মধ্য-এশিয়ার একটি বিচিত্র সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে পথপার্শ্বের পান্থশালায় আশ্রয় পাওয়া বিদেশী পান্থকে সনির্বন্ধঅনুরোধ করা হত কিছু আঞ্চলিক সমস্যা মিটিয়ে দেবার জন্য। বিনিময়ে পথিককে দেওয়া হত বিনামূল্যে আহার, আশ্রয়, এমনকি পারিশ্রমিক। সমস্যাটা কী? স্থানীয় কিছু প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকে বিবাহের উপযুক্ত করে তোলা। হয়তো সেই কুমারী মেয়েটি স্থানীয় কোন যুবকের প্রেমে পড়েছে, অথবা পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষ উভয়েই সম্মত হয়েছে—কিন্তু যতদিন না কোনও ভিন্‌দেশী পান্থ মিলনের প্রাথমিক অন্তরায়টা অপনোদিত করে দিচ্ছে ততদিন বিয়ের ফুল ফুটবে কী করে? গ্রাম-বৃদ্ধদের সনির্বন্ধ অনুরোধ বেচারি পান্থ এড়াতে পারে না। একের পর এক কনে বাড়িতে যায় আর উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী কন্যাদের বিবাহের উপযুক্ত করে, রক্তপাতের অভিশাপ নিজ মাথায় ধারণ করে ফের পথে নামে। মার্কোপোলো সখেদে বলেছেন: কখনও কখনও এজন্য পথিকের বিলম্বও হয়ে যেত, কারণ একই রাত্রে অতগুলি কুমারীকন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত করে তোলার দৈহিক ক্ষমতা হয়তো যাত্রীর নেই।

এই কুলাচারটি এক এক দেশে এক এক রূপ নিয়েছে। কোথাও নিয়মটা হয়েছে এই রকম—রক্তপাতের সম্ভাবনা এবং মিলনপথের প্রথম বাধাটি অপসারণ করবে—বর ভিন্ন বরযাত্রীদলের যে কোন যুবক। পশ্চিম আফ্রিকার এক আদিম আরণ্যক সম্প্রদায়ে যে বীভৎস প্রথাটি এ যুগেও প্রচলিত তার বর্ণনা দিচ্ছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক [13], 'বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলে কনে বরের ঘরে শুতে যেতে পারবে না। বরযাত্রীরা সকলে ধরাধরি করে নববধূকে চিত করে শুইয়ে দেবে এবং বর স্বয়ং তার দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে কনের মাথাটা। বসবে তার শিয়রের দিকে হাঁটু গেড়ে, কনের দুই হাত মাটিতে চেপে ধরে। বরযাত্রী দলের প্রত্যেকটি পুরুষ অতঃপর উদ্দাম নৃত্যগীতের আসর জমাবে এবং একে একে ঐ নিরুপায় নববধূতে উপগত হবে। সব অনুষ্ঠান শেষে বর স্বয়ং অচৈতন্য উলঙ্গ নারীদেহটা উঠিয়ে নিয়ে যাবে।"

এই 'টাবু' বা কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে প্রচলিত হয়েছিল একটি ব্যাপকবীভৎস প্রথা: 'প্রথম রাত্রির অধিকার'। সুযোগ নিয়েছিল, বলা বাহুল্য গোষ্ঠীপতি, পুরোহিত এবং ভূম্যধিকারীর দল। এ প্রথা মধ্যযুগেও বিভিন্ন তথাকথিত সভ্যসমাজে প্রচলিত ছিল—ফ্রান্সে, জার্মানিতে এবং ইংলন্ডে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা অ্যাংগেল্‌স বলছেন,[14] "উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—আরাগানে এই কুলাচার সাম্প্রতিককালেও

প্রচলিত ছিল। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ডিনান্ড দ্য ক্যাথলিক আইন করে এই প্রথা রদ করেন। সেই ঐতিহাসিক সনদটি উদ্ধার করা গেছে। তাতে বলা হয়েছে, অতঃপর এই আইন গৃহীত ও ঘোষিত হইল যে, উপযুক্ত কর্তামশাইয়েরা (সেনর, ব্যারন, ভূম্যধিকারী) প্রথম রাত্রির অধিকারচ্যুত হইলেন। অর্থাৎ কোন কৃষক বা গ্রামবাসী বিবাহ করিলে তাহার নববধূটিকে প্রথম রাত্রি অতিবাহনের জন্য কর্তামশাইয়ের ভদ্রাসনে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে না।" পতিতাবৃত্তি বিষয়ে যিনি মৌলিক গবেষণা করেছেন সেই ডক্টর আঁরিখ্ লিখেছেন [15], "প্রথম রজনী উপভোগের এই ব্যবস্থাটি মধ্যযুগে গোষ্ঠীপতি ও নৃপতিগণের করায়ত্ত ছিল যে ভূ-খণ্ডে, তাহার বিস্তৃতি বিস্ময়কর—ব্রাজিল হইতে গ্রীনল্যান্ড এমনকি সুদূর ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ।"

এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলে গ্রাম্য বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে নববধূকে নিয়ে বর উপস্থিত হত কর্তামশায়ের বাগান বাড়িতে—দেউড়ি পার করে দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকত খিড়কির দরজায়, প্রভাতের প্রতীক্ষায়। ভোর রাতে পাইকের পিছন পিছন খিড়কি দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে আসত ; কিম্বা সদর দরজাতেই কখনও বা কর্তামশাই স্বয়ং মেয়েটির হাত ধরে বেরিয়ে আসতেন। মদমত্ত কণ্ঠে বলতেন, বেশ সুন্দর বউ হয়েছে রে তোর। ঘরে নিয়ে যা এবার। গুরুপ্রসাদী করে দিয়েছি।

২।। **সমাজনৈতিক প্রেরণা—**

ক. যৌথ যৌনাচারের উত্তরাধিকার : এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য অ্যাংগেল্‌স্-এর অভিমত। তাঁর মতে [16] —ভৌগোলিক সীমানা-নিরপেক্ষ সমগ্র মানব সমাজকে তিনটি কল্পে (epoch) বিভক্ত করা যায়। যথা: জংলী (Savage), বর্বর (Barbaric) এবং সভ্য (Civilized)। ওঁর মতে প্রথম কল্পের শুরু পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে, মানুষ যখন নিয়েনডার্থাল পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হল; শেষ হয়েছিল—তীর-ধনুক আবিষ্কারের ক্রান্তিকালে। বর্বর-যুগের প্রারম্ভ পোড়ামাটির তৈজস ব্যবহার থেকে, সমাপ্তি—লৌহ আবিষ্কারে। ঐ দুটি প্রথম-দ্বিতীয় কল্পে 'বিবাহ' বলে কোনও ধারণা ছিল না। সে সমাজে না ছিল কেউ বহু-পতিক, না কেউ বহু-পত্নিক। তার ভিত্তি যৌথ-যৌনজীবনে। কিন্তু তা বলে তা জীবজগতের মতো বাঁধন-ছেঁড়া নয়। হয় তা 'কনস্যাঙ্গুইন' (Consanguine) অথবা 'পুনালুয়ান' (Punaluan)। জীবজগতের সঙ্গে এ দুটি প্রথার পার্থক্যটা কী? জীবজগতে—মাছ-পাখি-স্তন্যপায়ী অন্যান্য জীব কোনও বাঁধন না মেনে মিলিত হয়। তাদের দুটি শ্রেণী : পুরুষ ও স্ত্রী। জংলী ও বর্বর কল্পের যৌথ-যৌনজীবন সে রকম বাঁধন-ছাড়া ছিল না। কারণ তখন গোষ্ঠীসচেতনতা

জন্মলাভ করেছে, বা করছে। ফলে, কোন এক গোষ্ঠীভুক্ত নারী নিজগোষ্ঠী অথবা অপর গোষ্ঠীর কোন্ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে তার নির্দেশ ছিল। তার দুই মূল ধারণার নাম—কনস্যাঙ্গুইন ও পুনালুয়ান। প্রসঙ্গত বলি, দণ্ডকারণ্যে মুরিয়া আদিবাসীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম প্রতিটি মুরিয়া-রমণীর চোখে স্বজাতের পুরুষেরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—'আকোমামা' (যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে) এবং 'দাদাভাই' (বিবাহ নিষিদ্ধ)। যাই হোক, অত বিস্তারিত আমাদের না জানলেও চলবে। ঐ দুটি ধারণাকে যুক্ত করে আমরা সংক্ষেপে তাকে বলতে পারি : মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

অর্থাৎ সন্তানের পিতৃপরিচয় ছিল না, মাতৃপরিচয় ছিল। মায়েরাই সন্তানকে স্তন্যদান করবে। লালন-পালন করবে। 'বিবাহ' যখন নেই তখন 'পিতৃপরিচয়' থাকবে কী করে?

বস্তুত মানুষ যতদিন ছিল যাযাবর, ততদিন পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজনও ছিল না। গোল বাধল যেদিন মানুষ কৃষিনির্ভর হতে শিখল। জনপদ গড়ে তুলল। এতদিন মায়েদের কোনও সমস্যা ছিল না—সন্তান সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি জননী গোষ্ঠীপতির কাছ থেকে আহার্য লাভ করত। আহার্য বলতে নিহত পশুর মাংস, সংগৃহীত ফলমূল বা মধু। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পের শেষাশেষি দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। গোষ্ঠীপতি বা সর্দার জনবসতি-সংলগ্ন চাষযোগ্য ভূখণ্ডকে ভাগ করে দিলেন তাঁর অধীনস্থ পুরুষদের মধ্যে—চাষাবাদ তারাই করবে। ফলে শুরু হল ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। রমণীকুল প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হল। সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব তার—সে দায়িত্ব সে অস্বীকার করতেও চায় না—কিন্তু সমাজের সম্পদ, আহার, নিরাপত্তা সবই চলে গেছে তাদের সন্তানদের অজ্ঞাত পিতৃকুলের কব্জায়। ফলে, সামাজিক প্রয়োজনে প্রবর্তিত হল একটি কানুন : বিবাহ।

অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে এল আরও একটি চিন্তাধারা: সতীত্বের সংজ্ঞা।

আসবেই। বিবাহ হচ্ছে 'বি পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঙ'—পুরুষদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল বিশেষভাবে বহন করার দায়িত্ব— স্ত্রীকে, সন্তানকে। ফলে পুরুষ নিশ্চিত হতে চাইল যার ভার সে বহন করবে সেই সন্তান-সন্ততি যেন আবশ্যিকভাবে তারই হয়। পুরুষ ব্যভিচার করলে তার প্রমাণ থাকে না—ব্যভিচারের চিহ্ন দশ মাসকাল বর্ধিত চন্দ্রকলার মতো তার দেহে ষোলোকলায় পূর্ণ হয় না। নারীর হয়। তাই সন্তানের মুখ চেয়ে—অর্থাৎ 'হোমো-স্যাপিয়ান্স' নামক প্রজাতির নিরাপত্তার প্রয়োজনে, জৈবিক নিয়মে, বিবর্তনের মৌলসূত্র মেনে, বিবর্তিত হল : সতীত্বের সংজ্ঞা।

কুমারী-বলির জন্য এতক্ষণ আমরা শুধু পুরুষদের দোষারোপ করে এসেছি, কিন্তু কুমারীত্বের ধারণাটা বস্তুত যে পূর্ববর্তী ধারণার অনিবার্য অনুষঙ্গ, 'করোলারি', সেই 'বিবাহ'- নামক রীতিটির প্রচলন হয়েছে নারীজাতির স্বার্থে, তাদের সনির্বন্ধাতিশয্যে।

আজকের 'উইমেন্‌স্ লিব্'-এর ধ্বজাধারিণীরা নোট করে রাখুন: এ তাঁদের স্বখাত-সলিলে নিমজ্জন।

অ্যাংগেল্‌স্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "সমাজ সৃষ্টির উষাযুগে স্ত্রীলোক ছিল পুরুষের দাসী—এই ভ্রান্ত ধারণাটি অষ্টাদশ-শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির কাল থেকে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। বাস্তবে জংলী এবং বর্বরকল্পে স্ত্রীলোকেরা ছিল মুক্ত, স্বাধীন, এবং সম্মানীয়া। ...বিবাহ-প্রথা পুরুষের আমদানি নয়। পুরুষ কোনদিনই এটা চায়নি, চাইতে পারে না—এমন কি আজকের দিনেও নয়। যৌথ অথবা গোষ্ঠীগত বিবাহে তার দৈহিক চাহিদা মিটত অথচ দায়িত্ব ছিল না কিছু। সমাজে 'বিবাহ' অর্থাৎ জোড়-বাঁধা দ্বৈতপরিবারের পরিকল্পনাটি স্ত্রীজাতীয়দের আবিষ্কার এবং তাদের পীড়াপীড়িতেই।"[17]

খ. আতিথেয়তার ফলশ্রুতি : কোন কোন পণ্ডিতের মতে রতি-মন্দিরে কুমারী-বলির প্রচলন হয়েছে আতিথেয়তার ধারণার সম্প্রসারণে। তাঁরা বলেন, বিদেশী অতিথি—বণিক, ব্যবসায়ী, রাজপ্রতিনিধিদের আশ্রয় দেওয়া হত মন্দির-সংলগ্ন পান্থশালায়। তাদের আহার, পানীয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী মেটানোর দায় নগরবাসীর। কিন্তু বিদেশী পান্থ কি শুধু আহার্য আশ্রয়েই ছেড়ে-আসা গৃহের সুখসুবিধা পেতে পারে? তার প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর বিকল্প হিসাবে প্রয়োজন একটি সাময়িক শয্যাসঙ্গিনীর।

আমার মনে হয়েছে, এ থিয়োরিটা গ্রাহ্য হতে পারে না। অতিথিসেবার আতিশয্য যদি প্রতিটি নগরসভ্যতা মেনেও নিয়ে থাকে তবুও অতটা বাড়াবাড়ি অবিশ্বাস্য। সেক্ষেত্রে নগরপ্রধান, শ্রেষ্ঠী এবং পুরোহিতেরা বিকল্প ব্যবস্থায় যত্নবান হতেন। বাগানের ফল, ক্ষেতের শস্য, গোয়ালের গরুর দুধের সঙ্গে অনূঢ়া কন্যার যৌবনকে সমমূল্যমানের বলে চিহ্নিত করতেন না। অর্থমূল্যে পতিতালয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করতেন অথবা অন্তঃপুরে সঞ্চিত উপপত্নীদের কাউকে অতিথি-সৎকারমানসে পাঠাতেন।

গ. পুরোহিত-তন্ত্রের ব্যভিচার : অপর একদল পণ্ডিতের মতে 'প্রথম রজনীর অধিকার' করায়ত্ত করার পর পুরোহিতরা নিজেরাই এই ব্যবস্থাটি কায়েম করেছিল। নিজেদের রিরংসা অব্যাহত রাখতে। এই মতটাও মেনে নেওয়া চলে না। একই হেতুতে; অর্থাৎ সেক্ষেত্রে নগর-নৃপতি এবং প্রধান পুরোহিত নিজ নিজ কুমারী কন্যার সতীচ্ছদ ছিন্ন করবার এই বর্বর ব্যবস্থায় নিশ্চয় সায় দিতেন না।

সব কয়টি মতামত তৌল করে আমাদের মনে হয়েছে—অন্যান্য হেতুগুলি কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় ছায়াপাত ঘটালেও এই অদ্ভুত এবং প্রায় সর্বব্যাপি ব্যবস্থাপনার মূলে রয়ে গেছে অ্যাঙ্গল্‌স্-বর্ণিত হেতুটি। অর্থাৎ পূর্বকল্পের যৌথ-যৌনাচারের ফলশ্রুতি। হয়তো তার সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মিশেছে উর্বরতা অথবা/এবং কুমারী তত্ত্ব অথবা/এবং বলিদান-প্রথার প্রভাব।

দেবাদাসী-প্রথা ভারতবর্ষে কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও কিসের প্রেরণায় তা আমদানি করা হয়েছে তা অনুমান করা যায়:

বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে ঘটনাটা হচ্ছে 'কনভার্স থিওরেম'—এখানে মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে নিজের আদলে। উপনিষদের নিরাকার পরম ব্রহ্ম যেদিন পৌরাণিকযুগে সাকার হতে শুরু করলেন—তাঁদের হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কল্পনা করা হল, তখন পুরোহিত-তন্ত্র স্বতই চিন্তা করতে শুরু করল, মানব-দেহধারী দেবদেবীদের ঐহিক-তথা-দৈহিক সুখসুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তেছে। নগরাধিপতির অনুকরণে মন্দিরাধিপতিকে দৈনিক স্নান করানো, ভোগ-রাগের আয়োজন শুরু হল। পূজা আরতি; নৈবেদ্যের পর "পানার্থে গঙ্গোদকং"এ তার পরিসমাপ্তি ঘটল না, ব্যবস্থা করতে হল, আহারান্তে "তাম্বুলার্থে গঙ্গাজলং"! এমন কি মহারাজ যেহেতু আহারের পর মুখপ্রক্ষালন করে থাকেন তাই দেবতার জন্য "পুনরাচমনের মন্ত্রসহ মুখপ্রক্ষালনের" আয়োজনও হল। কিন্তু আচমনের পর মহারাজ কী করেন? নিদ্রা? ঠিক তা নয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে থাকে আরও কিছু। অগত্যা পুরোহিতের দল খুঁজতে থাকে দেবতার উপযুক্ত এক বা একাধিক শয্যাসঙ্গিনী।

হয়তো স্থূলভাবে বলেছি, কিন্তু ধারণাটা এভাবেই এসেছে। ধারণাটা নিজে থেকে আসেনি। পুরোহিত-তন্ত্রই তাকে ঐ ভাবে এনেছে। নিজ স্বার্থে যে ব্যবস্থাপনাটা সে করতে যাচ্ছে তাতে ধর্মীয় রাঙতার মোড়ক এভাবেই চড়ানো হয়েছে।

কীভাবে দেবদাসীদের সংগ্রহ করা হত তার কোনও ঐতিহাসিক দলিল নেই। অন্তত আদি ও মধ্যযুগে। কিন্তু মন্দির পরিভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সূত্র ধরে আমরা কিছু তথ্য পাচ্ছি। মন্দির পরিভাষায় দেখছি দেবদাসীদের ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে:

বিক্রীতা— অর্থের বিনিময়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ যখন কোন কুমারীকে ক্রয় করেন তখন সে বিক্রীতা দেবদাসীরূপে গণ্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা অত্যন্ত গরীব সম্প্রদায়ের সুন্দরী বালিকা। একাধিক কন্যার পিতা সব কয়টি আত্মজাকে পাত্রস্থ করতে পারবে না আশঙ্কা করে দু-একটিকে তুলে দিত পুরোহিতদের হাতে। দেবদাসীর গর্ভজাতা কন্যাও এই দলভুক্তা ; মা যেহেতু কেনা-দাসী, তাই তার কন্যাও তাই। বালিকাবয়স থেকে তাকে নানান বিদ্যা ও কলায় পারঙ্গম করে তোলা হত—নৃত্য, গীত, অক্ষর-পরিচয়, কাব্য, পুষ্পচর্চা, আলিম্পন বিদ্যা ইত্যাদি। মন্দিরের প্রধানা দেবদাসীর তত্ত্বাবধানে তারা ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তা হয়—"পহিলে বদরিসম, পুনন্বরঙ্গ / দিনে দিনে অনঙ্গ আগোড়াল অঙ্গ।" রজোদর্শনের পর প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে কিশোর মেয়েটির 'অভিষেক' হয়। অর্থাৎ কোন এক পুণ্য লগ্নে তার বিবাহ

হয়—বর কখনো দেববিগ্রহ স্বয়ং, কখনো বা তাঁর কোন প্রতীক—ত্রিশূল, চক্র বা তরবারি। সেই রাত্রেই মেয়েটির ফুলশেয রচিত হয়। মন্দির পুরোহিত স্বয়ং অথবা তাঁর নির্দেশে কোন অধীনস্থ কর্মচারী নবাগতার কৌমার্য হরণ করে তাকে পরিপূর্ণ দেবদাসীতে রূপান্তরিতা করে। সেই রাত্রি থেকে মেয়েটি হয়ে যায় আজীবনের জন্য দেবদাসী।

ভৃত্যা—এরা মূলত পরিচারিকা। মন্দিরের যাবতীয় মেয়েলি কাজ—ঝাড়া মোছা, মন্দির-প্রক্ষালন, তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখা, নৈবেদ্য ও ভোগ প্রস্তুত করা, চন্দন-বাটা, পুষ্পচয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য এদের প্রয়োজন। শ্রেণীগতভাবে এরা অপর দলের চেয়ে নিচে। অবশ্য যৌবন থাকলে তাদের দেহদানকার্যও কর্তব্যভুক্ত। নৃত্যগীতের আসরে এরা উপস্থিত থাকলেও প্রায়শ অংশ গ্রহণ করত না।

ভক্তা—স্বেচ্ছায় যখন কোন রমণী—কুমারী অথবা স্বামীত্যক্তা, মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে দেবদাসী হতে চায় তখন সে 'ভক্তা'। এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা—ভক্তি। এঁরা অনেকে অতি উচ্চ শ্রেণী থেকে আসতেন—আর্থিক ও সামাজিক বিচারে। মধ্যযুগে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চের 'নান' বা সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যায়। এঁরা পর-পুরুষকে দেহদানে বাধ্য থাকতেন না। এঁদের প্রসঙ্গেই আনি বেসান্ট লিখেছিলেন, "প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে এক শ্রেণীর পূত চিরকুমারী সেবারতা থাকতেন—তাঁদের বলা হয় দেবদাসী। তাঁরা সন্ন্যাসিনী, জিতেন্দ্রিয় এবং ঈশ্বরেই কায়মনঅন্তরাত্মা সমর্পণ করতেন।" চিতোর-মহিষী মীরাবাঈ ভক্তা শ্রেণীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি কোনও সাধারণ মন্দিরে বসবাস করেননি, তবু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন—দেবদাসী।

দত্তা—'ভক্তা' শ্রেণীর সঙ্গে 'দত্তা'র পার্থক্য দু-জাতের। প্রথম কথা, ভক্তা শ্রেণীর মৌল প্রেরণা ভক্তি ; অপরপক্ষে 'দত্তা'র প্রেরণা দু-জাতের হতে পাবে। —অন্ধ বিশ্বাস অথবা আত্মরক্ষা। দ্বিতীয় কথা, ভক্তা-শ্রেণীর সন্ন্যাসিনী ঐহিক অর্থে দৈহিক মিলনে বাধ্য নয়; অপরপক্ষে দত্তা শ্রেণীর দেবদাসীকে মন্দির পুরোহিত অথবা পৃষ্টপোষক অতিথিদের দৈহিকঅর্থে সন্তুষ্ট করতে হত। আর একটু বিস্তার করে বলা যেতে পারে : কোনও পুণ্যলোভী গৃহস্থ মনস্কামনা চরিতার্থ করতে, 'মানত' রাখতে, স্বেচ্ছায় কন্যাকে মন্দিরে দান করতে পারে। এটা অন্ধ বিশ্বাস। অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতাও। গঙ্গাসাগরে সন্তান সমর্পণ কুপ্রথার সঙ্গে এখানে তুলনা করা যেতে পারে। তফাত এই—গঙ্গাসাগরে বিসর্জিত শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণা ক্ষণিক এবং সে মৃত্যুযন্ত্রণার যঙ্গে যুক্ত হত না মানসিক যন্ত্রণা—সমাজ, সংসার পিতামাতার বিরুদ্ধে দুরন্ত অভিমান। কিম্বা হয়তো সহস্রাব্দির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণায় মেয়েটিও শিকার হত। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মতো, এই পতিতাবৃত্তির ক্লেদকে মেনে নিত নিয়তির অনিবার্য

অভিশাপ বলে। এখানে জয়দেব ঘরণী পদ্মাদেবীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। কিংবদন্তী বলে, বালিকা বয়স থেকেই পদ্মাবতী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কার পরামর্শে বলা হয়নি, কিন্তু এমন একটি সর্বগুণান্বিতার স্থান জগন্নাথদেবের মন্দির —এ কথাই স্থির করলেন পদ্মাবতীর পিতামাতা। তখন পদ্মাবতী পঞ্চদশী। দূর গ্রাম থেকে ওঁরা পদব্রজে এলেন পুরীধামে, একমাত্র কন্যাটিকে দারুব্রহ্মের চরণে সমর্পণ করে ওঁরা বানপ্রস্থে যাবেন। কিশোরী পদ্মাবতী বোধ করি বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী হতে চলেছে। বুঝল, যখন তাকে চন্দনচর্চিত করে, পুষ্পভারনম্র বধূবেশে মন্দিরে নিয়ে আসা হল। প্রস্তাবটা শুনে বড় পাণ্ডার লালসাজর্জর দৃষ্টিতে সে বুঝি কিছুটা অনুমান করল। সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপ্রান্তে।

প্রৌঢ় বড় পাণ্ডা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তার উৎকলীয় ভাষায় আশ্বাস দেয়, কাল দিন ভাল আছে, আমি নিজেই অভিষেক করে দেব। ক্রমে পদ্মাবতী 'গোপিকা' হয়ে যাবে।

বড় পাণ্ডা ওঁদের যাত্রীশালায় থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

কিংবদন্তী বলেনি, সে-রাত্রে মেয়েটি জনান্তিকে তার জননীকে প্রশ্ন করেছিল কি না—"মা! 'গোপিকা' কাকে বলে? কাল রাত্রে আমার 'অভিষেক' হবে মানে কী?"

কিন্তু কিংবদন্তী বলেছে, সে রাত্রে পদ্মাবতীর মাতা ও পিতা উভয়েই একটি বিচিত্র স্বপ্নাদেশ পেলেন। দু'জনেই স্বপ্নে দেখলেন, দারুভূত জগন্নাথ ওদের বলছেন, — এ তোরা কী করতে বসেছিস। পুরীধামে এসেছিস কেন? রাঢ়খণ্ডে বীরভূম অঞ্চলে আছে কেন্দুবিল্ব গ্রাম। সেখানে আমার এক উদাসীন ভক্ত আছে, নাম জয়দেব। পদ্মাবতীকে তার হস্তে সমর্পণ করে আয়। তাহলেই আমি তাকে পাব! ফলে, "জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে সেই উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পিতৃদেব আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন....আমি শুধু আপনারই চরণ সেবা করিব। অতঃপর কবি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিলেন।'[18]

কিংবদন্তী মানুন, না মানুন, পদ্মাবতী নিঃসন্দেহে দেবদাসী।

'দাস'? তাহলে জয়দেবের পাণ্ডুলিপিতে কেমন করে লেখা হল সেই মারাত্মক পংক্তিটা : 'দেহিপদপল্লবমুদারং।'?

দত্তা-শ্রেণীর দেবদাসীরা যে শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের শিকার একথা মনে করা ভুল। কারণ অভিভাবককে যে দান করতে হবে এমন কথা নেই। অনেক প্রাপ্তবয়স্কা রমণী— কুমারী অথবা স্বামীত্যক্তা—স্বয়ং মন্দিরে এসে 'দেবদাসী' হবার জন্য আবেদন করেছে

এমন নজিরও আছে। আত্মদানীও 'দত্তা'-শ্রেণীভুক্তা। এ-ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাতৃপিতৃহীন কিশোরী বা তরুণী আত্মীয়-স্বজনের লালসার হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায় মন্দিরের শরণ নিয়েছে। নিঃসন্দেহে দত্তা-দেবদাসীর জীবন পতিতালয়ের রূপোপজীবিনীদের অপেক্ষা অনেক-অনেক বেশী কাম্য। আত্মীয়-স্বজন—যে রক্ষক সেই ভক্ষক—তাদের রিরংসা ঐ মেয়েটিকে অন্যথায় অনিবার্যভাবে সেই লালবাতিজ্বলা চাক্‌লাটায় টেনে আনত।

দত্তা—এদের সম্বন্ধে মন্দির-সাহিত্য স্বতই স্বল্পভাষ—হেতুটা সহজবোধ্য। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় আইনের ফাঁকে এদের অপহরণ করে আনা হত। নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটির সন্ধান পেত না সে অঞ্চলের নগর কোটাল। বহু দূর দেশে মন্দিরের অন্ধকূপে বন্দিনীরূপে সে জীবন অতিবাহিত করত।

অলঙ্কারা—নামেই তাদের পরিচয়। এক মন্দিরে একজন। মন্দিরের মুকুটমণি। নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি-কলায় এরা পারদর্শিনী—অপূর্ব রূপবতী। অন্যান্য শ্রেণীর নামকরণের মধ্যে তাদের সংগ্রহকার্যের ইঙ্গিত আছে, অলঙ্কারা-শ্রেণীর দেবদাসীর তা নেই। বস্তুত যে-কোনও শ্রেণীর দেবদাসীই এই শীর্ষ পদে উন্নীতা হতে পারে—রূপ ও গুণের মাপকাঠিতে। মন্দিরের দেবদাসীদের সে হচ্ছে রানী। সকলে তার আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। শিবমন্দিরে তার নাম 'রুদ্রগণিকা', সম্বোধনে রুদ্রাণি ; বৈষ্ণব মন্দিরে তার নাম 'গোপিকা'। দেবদাসীর আমলাতন্ত্রের সোপানে যদিচ 'অলঙ্কারা'র স্থান সবার উপরে তবু এক-হিসাবে তার মর্যাদা ভক্তাশ্রেণীর নিচে। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—তুলনা করে বলা যায়, যেমন সসাগরাধরণীর অধিপতির আসন কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর নিচে। হেতু একটাই—অলঙ্কারা শ্রেণীর দেবদাসীকে ক্বচিৎ কখনও অতি উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষককে দেহদানে তুষ্ট করতে হত। তাই 'অলঙ্কারা'র তুলনা "ভক্তা"র সঙ্গে চলবে না, চলতে পারে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার 'রাজনটী' অথবা 'জনপদকল্যাণী'র সঙ্গে। 'রাজনটী' রাজানুগৃহীতা নৃত্যগীত-পটিয়সী রূপোপজীবিনী ;অপরপক্ষে 'জনপদকল্যাণী' প্রাইভেট-প্র্যাক্‌টিশনার। নিজ-মঞ্জিলে ইচ্ছামতো সে পুরুষ খরিদ্দারকে আমন্ত্রণ করে নৃত্য-গীত বা আর কিছু দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পারে। শ্রেষ্ঠী-বণিক-পান্থ আর হ্যাঁ, স্বয়ং রাজাও। রাজনটীর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামার নায়িকা, অপরপক্ষে 'জনপদকল্যাণী'র উদাহরণ বৈশালীর 'আম্রপালী' অথবা কপিলবস্তুতে বুদ্ধদেবের অনুজ নন্দের প্রণয়িনী, যার প্রাচীর চিত্র অক্ষয় হয়ে আছে অজন্তার ষোড়শ-গুহায়।

..... বোধকরি যুক্তিতর্কের এই কণ্টকবৃন্ত পাঠকের ভাল লাগিতেছে না। আমি কী করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—হে প্রাণ! হে প্রাণাধিক!—সে সব কিছুই নাই—ধিক।'

তথাস্তু! দেবদাসীসৌধের বনিয়াদের 'বঙ্কিম'-খিলান পরিত্যাগ করিয়া আসুন গন্নের সুপারস্ট্রাকচারের কারুকৃতি লক্ষ্য করা যাউক.....

দুই

খ্রীস্টপূর্বাব্দ দুইশত সাঁইত্রিশ। মহানগরী বিদিশার অনতিদূরে একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম। আর্যাবর্তের মানচিত্রে নামটি অচিহ্নিত : কাকনায়।[1] জনবসতি নিতান্ত অল্প, কিছুদূরে গোলপাতায়-ছাওয়া পর্ণকুটির ; তার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে কিছু মেহনতি মানুষ। আর বিদিশা নগরী থেকে আগত কিছু ভাস্কর, যারা ইতিপূর্বে ছেনি-হাতুড়ি চালনায় ছিল অনভ্যস্ত। তারা হস্তিদন্ত-শিল্পী। বিজন প্রান্তরে সদ্য গড়ে-ওঠা গণ্ডগ্রামের মধ্যভাগে একটি অনুচ্চ টিলা ;তার উপর দুটি ক্ষুদ্রকায় স্তূপ। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত দু-একটি বিহার, একটি চৈত্য এবং কিছুদূরে যেন সামান্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে একটি ভিক্ষুণী বিহার।

নির্মীয়মাণ সঙ্ঘারামের প্রধান অর্হৎ মহা-থের বুদ্ধভদ্রের দৃঢ়বিশ্বাস—কালে এই অখ্যাত জনপদটি হয়ে উঠবে মহাতীর্থ। বীজটি উপ্ত হয়েছে, মহীরূপে রূপান্তরিত হতে কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দী লাগবে—এই যা।

স্তূপ দুটির একটির গর্ভে সুসঞ্চিত মহা-অর্হৎ সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্গাল্যায়নের পূতাস্থি। অপরটিতে সঙ্গোপনে সংরক্ষিত হয়েছে এমন এক সম্পদ যা অচিন্ত্যনীয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মগধরাজ অজাতশত্রু সেই মহাসম্পদটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন কুশীনগরের অধিপতি মল্লরাজের নিকট থেকে, তাঁর বিচক্ষণ ব্রাহ্মণমন্ত্রী দ্রোণের সহায়তায়। মাত্র দুই দশক পূর্বে দেবনাম পিয়তস্‌স সম্রাট প্রিয়দর্শী সেই পরম সম্পদটি স্বহস্তে সংরক্ষিত করে গেছেন স্তূপগর্ভে।[2]

মূল স্তূপটিকে ঘিরে গড়ে উঠছে থভ-সূচী-বেদিকা-প্রদক্ষিণপথ। পূর্ব-তোরণটি সুসমাপ্ত, তার বরাঙ্গে জাতকের নানান কাহিনী। বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে দক্ষিণ-তোরণ। মহা-থের-এর অনুমতিক্রমে বিদিশার শিল্পীদলকে স্বীকৃতি দিতে তার একপ্রান্তে সম্প্রতি খোদিত হয়েছে একটি লিপি—"বিদিশাকেহি দন্তকারেহি রূপকম্মাম্ কৃতম[3]।"

আমাদের কাহিনী কালে, সেই দুইশত সাঁইত্রিশ খ্রীস্টপূর্বাব্দে গণ্ডগ্রাম কাকনায়ে নেমে এসেছে এক মর্মবিদারক দুঃখের ঘনান্ধকার। সংবাদবহ পাটলিপুত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে সেই নিদারুণ বার্তাটি নিয়ে: সদ্ধর্মের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক দেবনাম

পিয়তস্‌স মগধরাজ প্রিয়দর্শী আর ধরাধামে নাই।

ক্ষুদ্রায়তন চৈত্যে সমবেত হয়েছেন সকলে। চৈত্যটি আয়তাকার—দূরতম প্রান্তে একটি স্তূপ;দুই পার্শ্বে দুই সারি স্তম্ভ। ঘৃতপ্রদীপের আলোকবর্তিকায় সন্ধ্যার ঘনান্ধকার সত্ত্বেও চৈত্যাভ্যন্তর আলোকিত। এক দিকে বসেছেন ভিক্ষু, অপরদিকে ভিক্ষুণীর দল। সঙ্ঘারামের অগ্‌গবিনতা মহাভিক্ষুণী পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে স্তূপকে বরণ করলেন। মহাস্থের উচ্চারণ করলেন প্রার্থনামন্ত্র। সম্রাট প্রিয়দর্শীর আত্মার শান্তি-কামনা করে সান্ধ্যপ্রার্থনাসভার অবসান ঘটল।

মহাভিক্ষুণী সেবানম্রাকে পুরোভাগে নিয়ে ভিক্ষুণীর দল—সংখ্যায় তাঁরা মাত্র সাতজন— প্রত্যাবর্তন করলেন ভিক্ষুণী-বিহারে। অন্যান্য সকলে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বিদায় হলেন। মহাভিক্ষুণী তাঁর একান্ত-সহচরী মালতিকে ডেকে বললেন, আমার অজিনাসনটি বিছিয়ে দাও। আজ আমার উপবাস। আমি ধ্যানে বসব।

আদেশমাত্র মালতি ওঁর ধ্যানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিল। মহাভিক্ষুণী সেবানম্রা পঞ্চাশোর্ধ্বা ; তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, পরনে পীতবাস, সর্বাঙ্গে নেই কোনও আভরণ। কিন্তু এখনও তার দেহে জরা রেখাপাত করতে পারেনি। এখনও তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। নিঃসন্দেহে যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

সম্রাট প্রিয়দর্শীর মহাপ্রয়াণে তিনি আজ কিছু বিচলিতা। মালতী কক্ষ ত্যাগ করার পর তিনি অজিনাসনে উপবেশন করলেন না। পরিবেণের অপর প্রান্তে রক্ষিত একটি পেটিকার বন্ধন উন্মোচন করতে থাকেন। পেটিকাটি নানান তাল ও ভূর্জপত্রের পুঁথিতে আকীর্ণ। তার ভিতর হস্তসঞ্চালন করে নিম্নতম স্থান থেকে তিনি উদ্ধার করে আনলেন একটি অতিক্ষুদ্র রত্নমঞ্জুষা। তার গর্ভস্থ বস্তুটি আজ তিন-দশক আলোক স্পর্শ লাভ করেনি। বহুক্ষণ সেটিকে দুই হস্তে ধারণ করে মহাভিক্ষুণী রুদ্ধদ্বার পরিবেণস্থ নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মহাভিক্ষুণী আর দীপশিখা পরস্পরের উপমান তথা উপমেয় হয়ে গেল। তারপর অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বললেন, তুমি তো অশোক। তাহলে আমাকে কেন দিয়ে গেলে এত বড় শোক?

না ঃ। সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। রত্নমঞ্জুষার অভ্যন্তরে দৃক্‌পাতের লোভ সংবরণ করে পুনরায় সেটিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করলেন। অজিনাসনে ধ্যানে বসার উপক্রম করছেন এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত হল।

পুনরায় গত্রোত্থান করলেন মহাভিক্ষুণী। দ্বারের অর্গল মোচন করে বললেন, কী মালতি?

মালতি সলজ্জে ক্ষমা ভিক্ষা করে বলে আজ পূর্বাহ্ন থেকে এক অন্ধ বৃদ্ধ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। দুঃসংবাদ শ্রবণে আমরা কেউই সেকথা মনে রাখিনি। তিনি এখনও পরিবেণ-সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে অপেক্ষা করছেন।

মহাভিক্ষুণী বিস্মিতা হলেন, অন্ধ বৃদ্ধ! আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী।? কেন?

—সে-কথা তিনি শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে চান?

—উত্তম। কিন্তু যথাবিহিত অতিথি-সৎকার করা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আপনি অনুমতি করলে.....

—ঠিক আছে। তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

পরিবেণ অপ্রশস্ত। তদ্ভিন্ন সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। মহাভিক্ষুণী স্বয়ং এসে বসলেন পরিবেণ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের এক শিলাসনে। একটু পরেই বৃদ্ধের হস্তধারণপূর্বক মালতি প্রত্যাবর্তন করল। আগন্তুকের বয়স যদি ষাট হয়, তবে বলতে হবে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পরিধানে ধূলিমলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। নগ্নবক্ষের প্রতিটি পঞ্জর গণনা করা যায়। মালতি অন্ধকে সম্বোধন করে বলল, আপনি মহাভিক্ষুণী অগ্‌গবিনতার সম্মুখে এসেছেন। কী বলতে চান, বলুন?

বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে মহাভিক্ষুণীকে প্রণাম করলেন। বললেন, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, মা। কিন্তু আমি নিরুপায়। একটি ভিক্ষা আছে.....

—বলুন?

—আমি অন্ধ, অশক্ত। কিন্তু আমার পুত্রটি দক্ষ কারিগর। তাকে যদি অনুগ্রহ করে কাকনায় মহাবিহারের নির্মাণ কার্যে.....

—সে-কথা বলতেই কি এই মধ্যরাত্রে....

বৃদ্ধ সসঙ্কোচে বলেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মা!

মহাভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ আত্মসংশোধন করে বলেন, না, আমারই ভুল। শুনেছি আপনি দিবাভাগেই এসেছিলেন। আমরা একটি দুঃসংবাদ শ্রবণে—

—জানি মা, জানি। অমন ইন্দ্রের মতো মহারাজ....

—ইন্দ্রের মতো। আপনি তাঁকে স্বচক্ষে কখনো দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি বইকি। তখন আমার দৃষ্টি ছিল তো। সে আজ চার দশক পূর্বেকার কথা। তাঁকে দেখেছি। শালপ্রাংশু, মহাভুজ। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম যোগীমহেশ্বর মন্দিরে।

মহাভিক্ষুণী একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কী? কী? কী? মন্দির? যোগীমহেশ্বর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মধ্য আর্যাবর্তে। রামগড় পর্বতে। সেখানে নির্মিত হয়েছিল পাশপাশি দুটি গুহামন্দির—যোগীমহেশ্বর এবং সীতা-বঙ্কিমা। যোগীমহেশ্বরে পূর্বযুগে থাকতেন আদিকবি বাল্মীকি। আর সীতা-বঙ্কিমায় থাকতেন নির্বাসিতা সীতামাঈ। নিচ দিয়ে বহে চলেছে রেন্দ্ নদী। আমি সেই গুহামন্দিরের ভাস্কর ছিলাম, মা। অনেক-অনেক মূর্তি খোদাই করেছি সেখানে। গন্ধর্ব-কিন্নর, নৃত্যরতা দেবদাসী। তখন তো আমার দৃষ্টি ছিল...আর জানলেন মা, মন্দিরের প্রবেশ-তোরণে আমি একটি মূর্তি খোদাই

করেছিলাম; সুতনুকার....

সন্তান উচ্চারণ নয়, অনিবার্য প্রতিধ্বনির মতো মহাভিক্ষুণী বললেন, সুতনুকার!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ছিল সেই মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, রুদ্রাণী। অমন অসামান্যা সুন্দরীর —বাক্যটি শেষ হল না বৃদ্ধের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সব অবান্তর কথা শুনিয়ে কী লাভ? সুতনুকার সে রূপও নেই, রূপ দেখবার দৃষ্টিও নেই রূপদক্ষ দেবদিন্নর....

বৃদ্ধ নীরব হল। বোধকরি সে কোন বিস্মৃত অতীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে, আপনারা কি এখনও আছেন? মায়েরা?

মালতি সাড়া দেয় না। প্রস্তর-বেদিকায় মাথা রেখে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দীপশিখাটি হাতে নিয়ে যেন স্তূপ প্রদক্ষিণ করছেন অগ্‌গবিনতা। এদিক-ওদিক নানাদিক থেকে ঐ অন্ধ বৃদ্ধের ভিতর তিনি কী যেন খুঁজছেন।

—মা?

সম্বিত ফিরে পান এতক্ষণে! ছি ছি ছি! এ কী করছিলেন এতক্ষণ! কিসের এ কৌতূহল? আত্মবিশ্বাস ফিরে পান তিনি। বলেন, কিছুই নেই বলছেন কেন রূপদক্ষ? যোগীমহেশ্বর গুহায় আপনার সেই মূর্তিটা তো শাশ্বত হয়ে রইল—

—না মা, নেই। অপরাধীদের সন্ধান না পেয়ে সহস্রাক্ষের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ঐ মূর্তিটার উপর। সেটাকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

এবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল অগ্‌গবিনতার। বললেন, মূর্তিটাও তাহলে রইল না?

—শুধু কি তাই মা? তার পরিবর্তে শাশ্বত হয়ে রইল একটা প্রহসন! কে যেন সেই বিদীর্ণ মূর্তির পাদমূলে কৌতুক করে উৎকীর্ণ করেছে একটি পংক্তি—"দেবদিন্ন সুতনুকাকে ভালবেসেছিল।"

অগ্‌গবিনতা ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্তা। কূর্ম যেমন তার হস্তপদাদি নিজ দেহবর্মের ভিতর লুক্কায়িত করে, ঠিক তেমনি নিজ বিচ্ছিন্ন চিন্তা, উচ্ছ্বাস হৃদয়াবেগকে সঙ্কুচিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনি দৃষ্টি খুইয়েছেন কবে? কী করে?

—সে সব কথা শুনে আপনার কী লাভ, মা? দুঃখীর জীবন বড় দুঃখের।

—তবু বলুন আপনি।

—সহস্রাক্ষ অপরাধীকে খুঁজে পায়নি, কারণ আমি মধ্য আর্যাবর্তের অরণ্য-পর্বতে দীর্ঘ তিনমাস আত্মগোপন করে ছিলাম। শুধু ফলমূল আর ঝরনার জলই ছিল আমার জীবনধারণের উপাদান। ঐ সময় কোনও বিষাক্ত ফলের রসে আমার দুটি চক্ষুই নষ্ট হয়ে যায়।

—তারপর?

—তারপর আর কী বলব, মা? সহস্রাব্দের মৃত্যুর পর যোগীমহেশ্বরে গিয়েছিলাম; কিন্তু সুতনুকার সাক্ষাত পাইনি। সে নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর আমিও পথে পথে ফিরতে থাকি। এক জন্মদুখিনী আমাকে গ্রহণ করে। সে ছিল খঞ্জ, অন্ধ নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভর করে এতদিন বেঁচে ছিলাম। সে স্বর্গে গেছে; কিন্তু তার সন্তানটি আমারই মতো... না। আত্মপ্রশংসা করব না মা, আর আপনি তো আমার হাতের কাজ দেখেননি। আপনি বরং নিজে পরখ করে তাকে কাজে বহাল করবেন।

অগ্‌গবিনতা এতক্ষণে সম্পূর্ণ আত্মস্থা হয়েছেন। না, ঐ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রতি কোন আকর্ষণ, কোনও অভিমান, কোনও মোহ আজ তাঁর নাই। আজ এই মুহূর্তে যেন তাঁর উপসম্পদাগ্রহণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। একদিন—সেই যেদিন ছেনি হাতুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপের কাঙাল দেবদিন্ন প্রথম সুতনুকার তনুদেহটি আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছিল, চুম্বনে চুম্বনে তাঁকে উন্মাদ করে দিয়েছিল, সেদিন যেমন সুতনুকার ইচ্ছা করেছিল রামগড় পাহাড়ের শিখরে শিখরে, ঘোষণা করে বেড়াতে : 'আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি অমৃতের আস্বাদ'—ঠিক তেমনি আজ অগ্‌বিনতার ইচ্ছা করছিল, কাকনায়ের চৈত্য-বিহারের পথে পথে চিৎকার করে বলতে: "ওগো তোমরা শোন, আমি পেয়েছি মহাকারুণিকের কৃপা। আর কাউকে ডরাই না আমি। কিছুকেই ভয় করি না। বর্তমানকে জয় করেছিলাম, ভবিষ্যৎকে জয় করেছিলাম, আজ আমার অতীত জয় সুসম্পন্ন!"

সুতনুকা দেবদিন্নের বন্ধনমুক্তা হয়ে চিৎকার করেনি, বসে পড়েছিল রতিক্লান্তার মতো। অগ্‌গবিনতাও চিৎকার করে উঠলেন না, বসে পড়লেন বৃদ্ধের পাশে ধূলায়। করুণায় আপ্লুত হয়ে গেল তাঁর মাতৃহৃদয়। বললেন, ভয় নেই, রূপদক্ষ দেবদিন্ন। আপনার পুত্রকে কাল নিয়ে আসবেন। তাকে এই সঙ্ঘারাম নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করব আমি। বাকি জীবনে আপনার আর অর্থাভাব থাকবে না।

পরম আশ্বাসে চরম কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধ পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল অগ্‌গবিনতাকে।

মালতি বৃদ্ধের হাত ধরে প্রস্থান করা মাত্র অগ্‌গবিনতা পরিবেণের অর্গল রুদ্ধ করলেন। এবার তিনিও সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করলেন পরিবেণ-প্রান্তস্থিত বুদ্ধপ্রতীক ক্ষুদ্র স্তূপকে। অস্ফুট মন্ত্রোচারণ করলেন :

'উপনীতবয়ো চ দানি'সিম্
সম্‌পয়াতো'সি যমসস্ সন্তিকে।
বাসোপি চ তে নত্থি অন্তরা
পাথেয়্যম্‌পি চ তে ন বিজ্জতি।।[4]

বারম্বার আত্মসম্বোন্ধন করে স্বীকার করলেন, "এতদিনে তোমার যৌবনজ্বালা প্রশমিত হয়েছে। তুমি বৃদ্ধা হয়েছ, মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীত...এমতাবস্থায় তুমি

নিজের জন্য একটি নিভৃত পুণ্যদ্বীপ গঠন কর, নির্মল ও কামজয়ীর স্বাক্ষর রাখ।"

কামজয়ীর স্বাক্ষর। ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা উত্তরণের জয়স্তম্ভ। হ্যাঁ, এতদিনে সে মহান ব্রত-উদ্‌যাপনের মহালগ্ন সন্নিকট। যে অন্তর্লীন 'নাম'টি মনের অবচেতনে উঁকি দিলে ঐ যৌবনোত্তীর্ণা ভিক্ষুণী আজও রোমাঞ্চিততনু হতেন সেই নাম রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর চর্মচক্ষুর সম্মুখে উপনীত হল—তবু তাঁর কোনও চিত্তবিকার ঘটল না। রূপদক্ষ দেবদিন্নর প্রেতাত্মাকে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয়ে করুণার উৎসমুখটি উন্মোচিত হল শুধু।

—নমো বুদ্ধায় গুরবে, ধম্মায় তারিণে, সঙ্ঘায় মহোত্তমায় নমঃ।

পুনরায় পেটিকাটি বন্ধনমুক্ত করলেন। ঘৃতপ্রদীপটি উজ্জ্বলতর করে নির্ভয়ে এবার উন্মোচন করলেন ক্ষদ্রায়তন রত্নমঞ্জুষার আচ্ছাদন। দীর্ঘ তিন-দশকের বন্দিদশা উত্তরণে রাজাঙ্গুরীয় লক্ষ প্রতিবিম্বে হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে। এক প্রদীপের আলোকবর্তৃকা লক্ষরূপ পরিগ্রহ করে পরিবেণের পাষাণচত্বরে জ্বেলে দিল দীপান্বিতায় তারার মালিকা। অগ্‌গবিনতা অট্টহাস্য করে ওঠেন এতক্ষণে। আত্মজয়ের সাফল্যে। অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করে বলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আত্মজয় সম্পূর্ণ না করে তোমাকে বিদায় দেব না। আজ এই মুহূর্তে আমি আত্মজয়ী! কালই তোমাকে বিদায় করে দেব। সঙ্ঘের রত্নভাণ্ডারই তোমার একমাত্র স্থান।

প্রদীপ শিখাটি নির্বাপিত করে প্রস্তরশয্যায় শয়ন করলেন অতঃপর। মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন এতদিনে। অন্তর্লীন অতীত স্মৃতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করতে করতে এই তিন-দশক নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-জড়ানো সেই বুভুক্ষু সুতনুকাকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। আজ তিনি নির্ভয়। অনায়াসে মুক্ত করে দিলেন স্মৃতির রুদ্ধকপাট। ভেসে চললেন স্মৃতির চিন্তাস্রোতের উজানে—

সংবাদবহকর্তৃক আনীত একটি সুসংবাদে রামগড় পর্বতে আজ কর্মচাঞ্চল্য। সর্বত্রই একটা আনন্দোচ্ছ্বাস। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর পরমভট্টারক মগধাধিপতি সম্রাট অশোক স্বয়ং আসছেন যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে। সম্রাট সদ্য সিংহাসন লাভ করেছেন; চলেছেন উজ্জয়িনী থেকে পাটলিপুত্র— সেস্থল থেকে যাবেন চেদীরাজ্যে, কলিঙ্গ বিজয়ে। পথে রামগড় পর্বত। সংবাদবহ তাই বার্তা এনেছে—সম্রাট যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা সমাপনান্তে যুদ্ধযাত্রা করতে চান।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যোগীমহেশ্বর এবং সীতাবঙ্কিমা মন্দিরে।

শুধু একজন এ আনন্দ সংবাদে বিচলিত। তাঁর রক্তচন্দন ত্রিপুণ্ড্রকের দুই পার্শ্বে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি যোগীমহেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষ। তাঁর একান্ত সহচর বলভদ্র প্রশ্ন করে, গুরুদেব, এ সংবাদে আপনাকে এত বিচলিত

মনে হচ্ছে কেন?

সহস্রাক্ষ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বলভদ্র! আমার আশঙ্কা পরমভট্টারক পূজাদানমানসে আদৌ আসছেন না এখানে। চণ্ডাশোকের শ্যেন দৃষ্টি দেবদ্বিজে নাই, সে শুধু উদ্‌গ্রীব পরস্বাপহরণে।

গোপন কথাবার্তা হচ্ছিল মন্দিরের প্রাধানা দেবদাসী সুতানুকার একান্ত কক্ষে। সুতনুকা প্রশ্ন করে, কিন্তু তাতেই বা আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন গুরুদেব? আপনার তো সিংহাসনচ্যুত হবার আশঙ্কা নাই! আপনার এমন কী সম্পদ আছে যা তিনি হরণ করবেন?

সহস্রাক্ষ স্মিত হেসে বলেন, তুমি জান না, সুতনুকে। আমার মন্দির-ভাণ্ডারে এমন এক রত্ন আছে, যা মগধাধিপতির রাজকোষেও নাই।

সুতনুকা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না তার।

—সে সম্পদ তুমি! তোমার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি উজ্জয়িনী পর্যন্ত পৌঁচেছে। মহানগরী উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরে তোমাকে অপসারিত করার একটা ষড়যন্ত্র অনেক দিনই চলেছে। এত রূপ নাকি এ বিজন বনের পক্ষে বাড়াবাড়ি। একটা সংগ্রামের জন্য আমি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতও হচ্ছিলাম। কিন্তু মহাকাল-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটা হিমালয়ান্তিক মূর্খামি করে বসল। সম্রাট উজ্জয়িনীতে উপনীত হলে সে তাঁকে ই নিবেদন করল এই বার্তা! ভাবল, চণ্ডাশোক এই বিজন বন থেকে উদ্ধার করে তোমাকে উজ্জয়িনীর মন্দিরে দেবদাসী করবে। মূর্খটা চণ্ডাশোককে চেনে না। চণ্ডাশোক শ্রবণমাত্র স্থির করেছে—সত্যই যদি তুমি সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হও, তবে তোমার উপযুক্ত স্থান রাজধানী পাটলিপুত্র। সেই মহানগরীর রাজনটী হবে তুমি।

বজ্রাহত হয়ে গেল মেয়েটি। আবৈশোর মুগ্ধদর্শকের দৃষ্টির দর্পণে সে পাঠ করেছে ঐ বার্তাটি: সুতনুকা অসামান্যা সুন্দরী! কিন্তু তাই বলে পাটলিপুত্রের রাজনটীর পদ! সে যে উর্বশী-ঈপ্সিত!

স্মরণে আছে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার কথাও।

দুটি মন্দিরের মধ্যবর্তীস্থলে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। পশ্চাদ্ভাগে ধাপে ধাপে পর্বতসোপানে দর্শকাসন। সম্মুখে একটি সুবর্ণদণ্ড-শোভিত চন্দ্রাতপের কেন্দ্রবিন্দুতে সম্রাটের সিংহাসন। গুটি-তিনচার বয়স্য সমভিব্যাহারে তিনি আসীন; অর্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত দর্শকাসনের সম্মুখে নৃত্যগীতের আসর। একক নৃত্যে সেখানে স্বর্গ রচনা করছে যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা : সুতনুকা।

দর্শকদল স্তব্ধ, নির্বাক। নৃত্যান্তে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাল নর্তকী; প্রথমে দেবমন্দিরের দিকে ফিরে, পরে সসাগরাধরণীর অধীশ্বরকে।

সম্রাট আহ্বান করলেন, অগ্রসর হয়ে এস, রুদ্রাণি!

সভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হল দেবদাসী।

সম্রাট তার চিবুকটি উঁচু করে ধরলেন। দীপলোকে দীর্ঘ সময় একদৃষ্টে কী যেন লক্ষণ মিলিয়ে দেখলেন। চুম্বনতিয়াসী তরুণীর মতো নতনেত্রে প্রতীক্ষা করে রইল মেয়েটি।

সম্রাট বলেন, তুমি সার্থকনামা। মর্ত্যের উর্বশী।

সুতনুকার গণ্ডদ্বয়ে বালার্ক-অরুণাভা। সম্রাট বিদূষকের দিকে ফিরে বললেন, বল বটু, এই অনিন্দিতাকে কী পুরস্কার দেওয়া রাজধর্মসঙ্গত?

বিদূষক তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, শিরশ্ছেদের আদেশ, মহারাজ! পাটলিপুত্রের রাজনটী এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহসই পাবে না। ওকে বরং স্বর্গে পাঠিয়ে দিন—উর্বশী-মেনকা-রম্ভার নাসিকা ছেদন করে তাই দিয়ে একটা রত্নহার বানিয়ে ও গলায় পরুক!

সুতনুকা হেসে ফেলেছিল;কিন্তু সহস্রাক্ষের অক্ষিতারকা জ্বলে উঠেছিল অলাতখণ্ডের মতো। তাহলে তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। বিদূষকের তির্যক ইঙ্গিতই তার প্রমাণ।

সম্রাট নিঃশব্দে নিজ অঙ্গুলি থেকে একটি হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করে পরিয়ে দিলেন সপ্তদশীর চম্পকাঙ্গুলিতে। আংটিটা মাপে বড় হল। তা হোক, অঙ্গুরীয় সমেত তার কম্র করটি মুষ্টিবদ্ধ করে নিজ বজ্রমুষ্টিতে গ্রহণ করে সম্রাট বললেন, এই সামান্য অঙ্গুরীয় তোমার পুরস্কার নয় সুতনুকে—এ শুধু আমার দখলী-স্বত্ত্বের ইঙ্গিতবাহী। আমি চলেছি কলিঙ্গ বিজয়ে। যদি জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তবে তুমিই হবে আমার বিজয়ীর পুরস্কার! পরিবর্তে তুমি হবে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজনটী।

সুতনুকা বজ্রাহতা। সহস্রাক্ষ আগ্নেয়গর্ভ।

সম্রাট জনতার দিকে ফিরলেন। সেখানে সারি সারি উপবিষ্ট রূপদক্ষের দল, যারা অকৃত্রিম পর্বতগুহাকে ছেনি-হাতুড়ির শাসনে রূপান্তরিত করেছে কৃত্রিম গুহামন্দিরে। সম্রাট বললেন, আমার অভিলাষ—সুতনুকা এই মন্দির ত্যাগ করে পাটলিপুত্র যাত্রা করার পূর্বে তার একটি মর্মর আলেখ্য ঐ মন্দির তোরণের সম্মুখে খোদিত হক। কে সেই দায়িত্ব নিতে সম্মত?

সমবেত রূপদক্ষের দল অধোবদন হল।

সম্রাট বললেন, কে তোমাদের দলপতি? রামগিরি পর্বতের শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ—

একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হল।

সম্রাট বললেন, রূপদক্ষ! তোমার এবং তোমাদের কারুশিল্পে আমি মুগ্ধ। এখন আমি সম্রাট হিসেবে প্রশ্ন করছি না, শিল্প-শিক্ষার্থীর মতো জানতে চাইছি—বল, ঈশ্বরসৃষ্ট এই নারীমূর্তির হুবহু অনুকরণ কি সম্ভব?

বৃদ্ধ রূপদক্ষ সলজ্জে ঋণাত্মক শিরশ্চালন করল। জনতার একাংশে শ্রুত হল মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জনধ্বনি। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন

করে বৃদ্ধ বলল, সম্রাট! আমি বৃদ্ধ, নব্যযুগের রূপদক্ষরা এ বিষয়ে কী মত পোষণ করেন তা আমি জানি না।

—বটে! তা নব্যযুগের রূপদক্ষদলের কী বক্তব্য? আমি যেন কী একটা গুঞ্জন শুনলাম মনে হচ্ছে।

এইবার আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হল একজন তরুণ ভাস্কর। সম্রাট স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তাকে দর্শন করে। অসামান্য রূপবান সেই তরুণ। বিংশতি-বর্ষ বয়ঃক্রম হতে পারে। শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প বিশ্বকর্মার ভূমিকায় মর্ত্যে নেমে এসেছেন অভিনয় করতে!

—তোমার নাম? পরিচয়?

—আমার নাম দেবদিন্ন, আমি এক দীন লুপদক্‌খ।

—বল, রূপদক্ষ! কী বলতে চাও আমার প্রশ্নের উত্তরে? এই নারীর হুবহু অনুকরণ কি সম্ভব?

দেবদিন্নের কণ্ঠস্বরে এবার দীনতা নেই, বরং কিছুটা দার্ঢ্যের ব্যঞ্জনা। বললে, সম্রাট! আপনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বররূপে এ প্রশ্ন করেননি; নিজ স্বীকৃতিমতে এই মুহূর্তে আপনি শিল্প-শিক্ষার্থী। তাই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের পূর্বে আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করতে ইচ্ছুক: হুবহু অনুকরণ সম্ভব কি অসম্ভব এ-প্রশ্নের পূর্বে বলুন, সেটা কি বাঞ্ছনীয়?

সম্রাটের ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, কেন নয়? সুতনুকার প্রস্থানের পরে তার একটি নিখুঁত প্রতিমূর্তির এখানে স্থায়ী আসন পাওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—"নিখুঁত" এবং "হুবহু" কি সমার্থক, মহারাজ?

সদ্ধর্ম গ্রহণের পূর্বে অশোক ছিলেন চণ্ডাশোক, কিন্তু শিল্পের প্রতি অনুরাগ তাঁর আবাল্য। কৌতূহলী হয়ে বলেন কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি যদি এ রমণীর প্রতিমূর্তি গড়ি, তবে আমি তা 'নিখুঁত' করতে চাইব, 'হুবহু' অনুকরণ নয়।

সম্রাটের ওষ্ঠাধারে ফুটে উঠল মৃদু হাস্যরেখা। বললেন, তুমি কি মনে কর—ঐ আদর্শ রমণীমূর্তি ত্রুটিহীনা নয়?

যুক্তকরে রূপদক্ষ নির্ভয়ে নিবেদন করে তার বক্তব্য: আজ্ঞে হ্যাঁ সম্রাট। তাই মনে করি আমি।

সুতনুকা এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখছিল ঐ কন্দর্পবিনিন্দিত তরুণটিকে। তার এ কথায় সচকিত হল সে। তার নাসিকায় জাগল কুঞ্চনরেখা।

তৎক্ষণাৎ সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবদিন্ন বললে, এইবার ঐ অনিন্দিতার দিকে দৃকপাত করুন, সম্রাট! আমার প্রতিমূর্তির নাসিকা কোনদিন কুঞ্চিত হবে না। তার তনুদেহে শুধু অলঙ্কার থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না । তার দীপ্তি থাকবে, দাহ থাকবে না! তার বিকাশ থাকবে, প্রকাশ থাকবে না।

সম্রাট সহস্রাক্ষের দিকে ফিরে বললেন, এই রূপদক্ষকে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করুন। ব্যয়ভার রাজকোষের। প্রতিদিন সুতনুকা এক দণ্ডের জন্য এর সম্মুখে উপস্থিত হবে। বৎসরান্তে আমি এখানে প্রত্যাবর্তন করব। ও যদি নিজ প্রতিজ্ঞামতো মূর্তি নির্মাণে সক্ষম হয়, তাহলে ও হবে সম্রাট অশোকের রূপদক্ষদলের প্রধান ; যদি ব্যর্থ হয় তবে যোগীমহেশ্বরকে নরবলি দিয়ে যাব আমি!

এরপরের একটি বৎসরের কথা মহাভিক্ষুণীর স্মৃতিপট থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সহস্রাক্ষ যেমনভাবে খনিত্রের আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করেছিল দেবদিন্নের গড়া নারীমূর্তিটি, ঠিক সেইভাবে নির্মম আঘাতের পর আঘাতে গত তিন দশক ধরে মহাভিক্ষুণী তাঁর স্মৃতির পাষাণফলক থেকে নির্মূল করেছিলেন পরবর্ত্তী এক বৎসরের স্মৃতি। মনে পড়ে না, কিছুই মনে পড়ে না— একটি বৎসরের অপার্থিব আনন্দের সমুদ্রোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ স্তব্ধ। 'নিব্বাণ' প্রাপ্ত।

তবু সঙ্গীত সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও যেমন তার একটি রেশ থেকে যায়, ধূপ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরও যেভাবে বাতাসে ভাসতে থাকে তার সৌগন্ধ, তেমনি বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল আজও এই পঞ্চাশোর্ধ্বা মহাভিক্ষুণীর অন্তরে আভাসে ইঙ্গিতে ধরা দেয়।

এটুকু মনে আছে, প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নানান্তে এসে দণ্ডায়মানা হতে হত ঐ রূপদক্ষের সম্মুখে। আর মনে আছে—কী যেন একটা কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। সুতনুকার নাকি বারে বারে তাল কাটতো নৃত্যভঙ্গিমায়! নিত্যপূজায় দেখা যেত নানা জাতের ভ্রান্তি। সম্রাট চণ্ডাশোক আর কোনদিন ফিরে আসেননি কলিঙ্গ যুদ্ধ থেকে। চণ্ডাশোক নিহত হয়েছিল চেদী রাজ্যে ; সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন ধর্মাশোক। যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে।

তারপর? তারপর কী হল মনে নেই। শুধু এটুকু স্মরণ হয়—সহস্রাক্ষ জানতে পেরেছিল —চণ্ডাশোক নয়, ঐ রূপদক্ষ দেবদিন্নই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় সুতনুকাকে! বঞ্চিত করতে চায় যোগীমহেশ্বরকে তাঁর প্রধানা রুদ্রগণিকার সেবা থেকে। গুপ্তঘাতক নিয়োগ করল পুরোহিত। গোপন সংবাদটা সুতনুকাই দিয়েছিল দেবদিন্নকে। অসীম ক্ষমতাশালী সহস্রাক্ষের সমস্ত ষড়যন্ত্রজাল বিদীর্ণ করে দেবদিন্ন আত্মগোপন করল। আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি।

অগ্‌গবিনতা জানেন না, দেবদিন্নের গড়া সেই নারীমূর্তিটি সুতনুকার সৌন্দর্যকে

অতিক্রম করেছিল কি না, কিন্তু এটুকু জানেন—ঐ এক বৎসরে, না—ছেনি-হাতুড়ি নয়, অন্য কী-এক অতনু-মন্ত্রে সে সুতনুকানাম্নী একটি নারীর তনুতে তুলে দিয়েছিল অলঙ্কার, কেড়ে নিয়েছিল অহঙ্কার ;সুতনুকার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল শুধু প্রেমের দীপ্তি, দাহ নয়! তার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছিল বিকাশ।

সুতনুকা বুঝতে শিখল—রুদ্রগণিকার ভূমিকা একটা প্রহসনমাত্র। একটা বিরাট ষড়যন্ত্রজালের সে শিকার, পিঞ্জরাবদ্ধ হতভাগিনী। সুতনুকা গোপনে একদিন মন্দির ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেদিন তার লক্ষ ছিল রূপদক্ষ দেবদিন্ন। নিরুদ্দিষ্টকে সে খুঁজে বার করবেই। পারেনি।

তারপর একদিন তার ব্যর্থ মানবপ্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হল। দেহজ কামনা বাসনা নয়, মহাকারুণিকের কৃপাই হল একমাত্র কাম্য।

সুতনুকার মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যায় ঐ অন্ধ বৃদ্ধের সম্মুখে তার আত্মাও 'নির্বাণ' লাভ করল—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সুসম্পন্ন!

পরিনির্বাণের একান্ত ইচ্ছা নিয়ে অবশিষ্ট রইল—দেবদাসী নয়, বৃদ্ধাদাসী সেবানম্রা।

পরদিন প্রত্যূষে যখন শয্যাত্যাগ করলেন, তখনও তাঁর স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। পূর্ব আকাশে বালার্ক অরুণাভা—শুকতারা তার আলোকবর্তিকাটি এখনও ঐ দিবাকরের আলোকবন্যায় নিমজ্জিত করে দেয়নি। কিন্তু সে-মুহূর্ত আসন্ন। অগ্‌গবিনতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সর্বপ্রথমেই পুনরায় উন্মোচন করলেন সেই রত্নমঞ্জুষাটি। হীরকাঙ্গুরীয়টি নিষ্ক্রান্ত করে সেটি বেঁধে নিলেন পীতবসনের অঞ্চলপ্রান্তে। দিনের প্রথম কর্তব্য—সেটি সঙ্ঘের রত্নাগারে দান করে আসা।

মহাস্থবির বুদ্ধভদ্রকে অসঙ্কোচে পূর্ব জীবনের সমস্ত গ্লানির কথা খুলে বলেছিলেন একদিন—সে আজ তিন দশক পূর্বেকার কথা। সকল বার্তা শ্রবণান্তে মহাঅর্হৎ উপসম্পদা দান করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু স্বীকৃত হননি ঐ হীরকাঙ্গুরীয়টিগ্রহণ করতে। বলেছিলেন ভিক্ষুণি! (তখনও তিনি অগ্‌গবিনতার পদে উন্নীতা হননি) এটি তোমার কাছেই রাখ। এটিকে দান করবার অধিকার আজও তুমি অর্জন করনি। যেদিন অন্তরে অনুভব করবে অতীত নিঃশেষে মুছে গেছে—সুতনুকার তিলমাত্র অবশেষ নেই তোমার অন্তরে, সেদিন এসে এটি আমাকে হস্তান্তরিত কর।

আজ সেই মহালগ্ন সমুপস্থিত।

পরিবেণের অর্গল উন্মোচনমাত্র দেখা হয়ে গেল মালতির সঙ্গে।

পদবন্দনা করে মালতি বললে, মা, গতকল্য যে অন্ধ বৃদ্ধটি এসেছিলেন, তাঁর পুত্র এই অতি প্রত্যূষেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে কি অর্ধদণ্ডকাল পরে আসতে বলব?

অগ্‌গবিনতা সহাস্যে বললেন, না। আজকের শুভদিনটির সূচনা হক তাকে আশীর্বাদ করে। সে আমার সন্তানতুল্য। তাকে আহ্বান করে নিয়ে এস।

পরিবেণের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পাষাণচত্বরে এসে উপবেশন করলেন অগ্‌গবিনতা। অল্প পরে মালতির অনুগামী হয়ে এসে আবির্ভূত হল একটি বিংশতিবর্ষীয় তরুণ।

চিত্রার্পিতার ন্যায় আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মানা হলেন মহাভিক্ষুণী! তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল!

শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প মর্ত্যে নেমে এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে!

কৃতজ্ঞ তরুণটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে উদ্যত হল মহাভিক্ষুণীকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো দূরে সরে গেলেন অগ্‌গবিনতা! শুধু বললেন, ন্‌না!

—না? তরুণ রূপদক্ষ স্তম্ভিত। প্রশ্ন করে, আপনি, ...আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন না?

—না! প্রণাম গ্রহণের অধিকার অত সহজে জন্মায় না!

...ও অগ্‌গবিনতা! কী বলিলে? প্রণাম গ্রহণের অধিকার তোমার নাই? তাহা হইলে গতকল্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলে কোন্ আক্‌কেলে?...

ক্ষুব্ধ ভাস্কর গত্রোত্থান করে। মহাভিক্ষুণীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হয়। সেবানম্রার মুণ্ডিত মস্তক ওর বৃষাংসের সমতলে। তরুণ ভাস্কর বলে, প্রণাম গ্রহণ করুন আর না করুন, আপনি পিতৃদেবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

—ন্‌না। —রুদ্ধকণ্ঠ থেকে একটিমাত্র নঞর্থক শব্দ নির্গত হল।

—কী না? বিস্মিত তরুণ রূপদক্ষ কৌতূহলী।

অগ্‌গবিনতাকে বড় বিহ্বল মনে হল। সন্তরণ-অনভিজ্ঞা যেন সমুদ্রস্নানের সময় পায়ের নিচে বালুকার স্পর্শ পাচ্ছেন না। প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্তে যে ভয়ঙ্করী সমুদ্রতরঙ্গ তাঁর মাথার উপর উঠে পড়েছিল, পরমুহূর্তেই সাধন-অভ্যস্তার কাছে সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ সরে গেছে—তবু চরণপ্রান্তে যেন প্রত্যাশিত বালুকাভূমির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। মালতির দিকে ফিরে বললেন, অতিথিসেবার আয়োজন কর, মালতি।

মালতিও প্রণিধান করেছে—বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে—কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে চলেছে। ঘটনা-পরম্পরা তার বুদ্ধিসীমার অতীত, কিন্তু স্থানত্যাগের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু প্রাণিধান করতে তার কালবিলম্ব ঘটল না।

তরুণ পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কী যেন একটা কথা তখন বলতে চাইছিলেন?

অসীম আয়াসে আত্মসংবরণ করে প্রৌঢ়া বললেন, হ্যাঁ, শোন, সাঁচী-কাকনায়ে তোমাকে কোনও নির্মাণকার্যের দায়িত্ব দিতে আমি অক্ষম।

বজ্রাহত হয়ে গেল প্রত্যাশী ভাস্কর!

অগ্‌গবিনতার অধর বেপমান। অস্ফুটে শুধু বললেন, বাধা আছে।

অধোবদন হল অতিথি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। কেন এভাবে প্রতারিত হল, কোন অলক্ষ্য নির্দেশে মহাভিক্ষুণী সেবানস্রা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন, তা জানতে চাইল না। প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে ভিক্ষুণী বললেন, শোন। তাই বলে তোমার হতাশ হবার কিছু নেই। তুমি মহাতীর্থ উরুবিল্বে গমন কর—

—উরুবিল্ব? সে কোথায়?

—তার বর্তমান নাম: বুদ্ধগয়া। সেখানেও একটি প্রকাণ্ড চৈত্যমন্দির, সঙ্ঘারাম নির্মিত হচ্ছে। তোমার দৃষ্টিহীন পিতৃদেবকেও নিয়ে যাও। সেখানে যাতে তুমি কর্মলাভে সফল হও তা আমি দেখব—সেখানকার মহা-থেরকে আমি সুপারিশপত্র লিখে দেব।

বহুক্ষণ ইতস্তত করল তরুণ। কেন কাকনায়ে তার কর্মসংস্থান হতে পারে না —এ প্রশ্ন জানতে চাইল না। জানতে চাইল না কী তার অপরাধ। পরিবর্তে অস্ফুটে শুধু বলে, বুদ্ধগয়া যে অনেক দূরের পথ, মা। আমার পাথেয় কোথায়?

অগ্‌গবিনতা নিঃশব্দে তাঁর চীবরপ্রান্তে গ্রন্থিমোচনান্তে উদ্ধার করে আনলেন একটি অঙ্গুরীয়। ঐ সুঠাম তরুণের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করে তার অনামিকায় পরিয়ে দিলেন, সেই রাজাঙ্গুরীয়টি। এবার মাপে সেটা ঠিক হল। বিস্মিত তরুণ বলে, এ কী! এ যে হীরকাঙ্গুরীয়। এ যে মহার্ঘ।

—হ্যাঁ! তাই! মূল্য যাচাই করে সাবধানে এটিকে বিক্রয় কর। আর শোন, এই হীরকাঙ্গুরীয় যে তুমি আমার নিকট লাভ করেছ—এ-কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ কর না—না, তোমার পিতৃদেবকেও নয়।

এবার আর কৌতূহল দমন করা সম্ভবপর হল না। বললে, কেন?

অগ্‌গবিনতা নীরব। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাকুল।

ইতস্তত করে তরুণ বলে, এটা কি...এটা কি তাহলে অপহৃত সম্পদ?

—না, না, না, ——আমি....আমিই ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ের আইনসঙ্গত অধিকারিণী।

—তাহলে....?

একটু ইতস্তত করলেন মহাভিক্ষুণী। না, নীরব থাকার অধিকার তাঁর নাই। অভিধম্ম-মতে এ স্থলে নীরবতার অর্থ তাঁর অন্তর নিষ্কলুষ। সেটা অসত্য! পাতিমোক্ষ-মতে যেন তিনি অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি নিতে উদ্যতা;তাই অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, কাকনায়-সঙ্ঘারামের অগ্‌গবিনতার এটি একটি ...কী বলব? প্রাক্-সন্ন্যাসজীবনের বেদনাবহ দুঃস্বপ্ন।

শুকতারা এতক্ষণে সূর্যালোকে নিশ্চিহ্ন।

বার্লাক অরুণরাগে তরুণ ভাস্করের মুখমণ্ডল ভাস্বর। এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব ভিক্ষুণীর কম্র কপোল।

যেন উদয়ভানুর প্রথম কৌতূহল ঐ অসমবয়সের দুটি নরনারীর মুখে একটা কিছু খুঁজছে। বৃথাই। বোধকরি প্রভাতসূর্য সন্ধান করছিল সেই চিরন্তন প্রশ্নটার প্রত্যুত্তর —যোগীমারা পর্বতের কন্দরে দীর্ঘ বিশ শতাব্দী পূর্বে কোন্ অজ্ঞাত কবি যে প্রশ্নটা মহাকালের দরবারে একদিন পেশ করেছিলেন, যা আজও অমীমাংসিত প্রশ্নচিহ্নটিকে আঁকড়ে ধরে প্রতীক্ষা করছে :

"—ও কেমন করে নিঃশেষে নিমজ্জিত হল
এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে?"

তিন

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে কয়েকটি শব্দ পাই: বেশ্যা, গণিকা, পুংশ্চলী প্রভৃতি। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বা জীবনযাত্রার কোন নির্দেশ নেই। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যে তাদের চেহারাটা একটু স্পষ্ট; পুরাণগুলি অধিকাংশই খ্রীস্টজন্মের প্রায় সমসময়ে বা পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু প্রাক-বুদ্ধযুগের কাহিনী পুরাণকারেরা কতটা নিষ্ঠাভরে রচনা করতে পেরেছিলেন সেটাই বিবেচ্য। বৌদ্ধযুগে রূপোপজীবিনীদের উল্লেখ আছে, বুদ্ধের জীবনকালে এবং প্রাক-বুদ্ধযুগের জাতক- কাহিনীতে, যদিও সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত।

জাতক-যুগের কয়েকজন রূপোপজীবিনীকে আমরা ঘনিষ্টভাবে চিনি, রবীন্দ্রনাথের কৃপায়—বাসবদত্তা, শ্যামা, প্রভৃতি। এরা দেবদাসী নয় ; তার সহোদরা বলা চলে--এরা রাজনটী অথবা বৌদ্ধ জাতকের ভাষায়--জনপদকল্যাণী। কৌতূহলী পাঠককে এই প্রসঙ্গে জানাই যে, রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগুলি জাতক থেকে সংগ্রহ করলেও স্বকীয় কল্পনায় তাদের সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্ট করেছেন।

যেমন ধরুন শ্যামার[1] কাহিনীটি। জাতক অনুসারে বজ্রসেন আদৌ অন্যায় অপবাদে ধরা পড়েনি; সে সত্যই ছিল চোর। উত্তীয়ও স্বেচ্ছায় আত্মবলি দেয়নি—শ্যামা তাকে কৌশল করে নগর-কোটালের কাছে পাঠিয়েছিল বলি দিতে। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা জাতকানুসারে চৌড়চূড়ামণি বজ্রসেন শ্যামার অলঙ্কার অপহরণ করে পালিয়েছিল! শ্যামা তার সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ফিরেছিল বটে, কিন্তু তার প্রেরণার উৎসমূলে ছিল অপহৃত অলঙ্কারের পুনরুদ্ধার। বজ্রসেন-এর সাক্ষাৎ সে পায়, কিন্তু বজ্রসেনকে পায় না। বিফল মনোরথ শ্যামা তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে আসে। এই স্থূল উপাদানটুকু অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনী গড়ে তুলেছেন তার আবেদন সহস্রগুণে মর্মস্পর্শী।

কিম্বা ধরুন, দিব্যদানের বাসবদত্তার[2] কাহিনী। মথুরাপুরীর ভৌগোলিক অবস্থান

ঠিক আছে ; কিন্তু উপগুপ্ত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরে ছিলেন তথাগতর একান্ত ভক্ত, কিন্তু পেশাগতভাবে ছিলেন একজন 'ফার্মাসিউটিস্ট'। মথুরায় জনপদকল্যাণী বাসবদত্তা তার দাসীকে পাঠিয়েছিল মুদি দোকানে থেকে কিছু 'কালাগুরু' কিনে আনতে। ঝি বাজার করে আনলে আজকের দিনের গৃহস্বামিনী যা করে থাকেন, বাসবদত্তাও তাই করতে বসল, অর্থাৎ হিসাব নিতে। তার মনে হল ওজনে কম আছে। উপগুপ্ত ঠিকমতোই ওজন করে দিয়েছিলেন, বাস্তবে দাসীটি বাজার থেকে ফেরার পথে ঐ দুর্মূল্য বস্তুটির কিয়দংশে হস্তলাঘবতায় স্থানান্তরিত করেছিল মাত্র। কিন্তু মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। কর্ত্রীর তিরস্কার শুরু হতেই সে গালে হাত দিয়ে সে-কালীন প্রাকৃতে বলেছিল,"ওমা আমি কনে যাব গো। হ্যাঁ দিদিমণি। অমন কতাটি বোলনি বাপু! অমন কন্দপ্যকান্তি দোকানদার তোমারে ঠকাবে! তারে দেখলি তোমার নিজেরই পেত্যয় হত নি। সে যেন 'নিস্ময়ুর' কান্তিক।"

দাসীর উদ্দেশ্য সফল হল। রূপবর্ণনায় কৌতূহলী বাসবদত্তা স্বয়ং এল তদন্তে। এবং মজল। এখানে পৌঁছেও কবি কিন্তু জাতককারের বর্ণনার অনুসারী হতে পারেননি। জাতকবর্ণিত বৃষস্কন্ধ কামোদ্দীপক যুবাপুরুষ তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে গেল—"শুভ্রললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

পরের পংক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন জাতককারকে। ঐ পংক্তিটি জাতকের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ, "এখনো আমার সময় হয়নি....সময় যখন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।"

কবির মতে সেই সময় এসেছিল বসন্তকালে, বাসবদত্তার সঙ্গ যখন বিষাক্ত; কিন্তু জাতককারের বর্ণনায় উপগুপ্ত নটীর কাছে এসেছিলেন বধ্যভূমিতে—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তা নটীর শেষমুহূর্তে।

এত কথা কেন বলছি?

সুতনুকা-দেবদিন্নের প্রেমকাহিনী কপোল-কল্পনায় সজিয়ে নেবার কৈফিয়তহিসাবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত হওয়ার এ প্রেরণা স্বয়ং গুরুদেবের!

জাতক—তা সে যখনই রচিত হোক প্রাক্-বুদ্ধযুগের কাহিনী। বুদ্ধদেবের সমকালে পাচ্ছি আর একজন রাজনটীকে। আম্রপালীকে। বৈশালী নগরীর জনপদকল্যাণীকে। আম্রপালীর জন্ম নিয়ে নানান কিংবদন্তী। বিনয় পিটক অনুসারে আম্রপালী স্বয়ম্ভু। বৈশালী নগরী তখন লিচ্ছবীদের রাজধানী। লিচ্ছবীরাজ মহানামের একটি সুবৃহৎ আম্রকাননে আম্রপালী পূর্ণযৌবনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষাচার্যের নির্দেশে মহারাজ মহানাম সেই অযোনিসম্ভবার সন্ধানে নির্গত হন এবং আম্রকাননে তার সন্ধান পান। সকলকলাপারঙ্গমা এই সুতনুকাকে দেখে সকলেই মোহিত। কৌঞ্চ, শাক্য, মগধী ও লিচ্ছবীবংশীয় সকল রাজা এবং রাজপুত্রেরা এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারে

মুগ্ধ—সকলেই তাকে বিবাহ করতে উৎসুক। মহানাম প্রমাদ গণলেন। অযুত পাণিপার্থীর ভিতর মাত্র একজনকেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব—বাকি সকলেই হয়ে যাবে তাঁর শত্রু। অগত্যা মহারাজ 'গণ'-এর শরণ নিলেন। গণ হচ্ছে 'সিটি কাউন্সেল' --নগর প্রধানদের পঞ্চায়েত। গণ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন এই 'অনির্ভব' সুতনুকা ব্যক্তিবিশেষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে না—সে হবে বৈশালীর জনপদকল্যাণী : সর্বজনভোগ্যা প্রধানা নটী।

গণ-এর সিদ্ধান্ত অতঃপর জ্ঞাপন করা হল আম্রপালীকে। সে সহাস্যে বলল, আপনাদের এই বিচার আমি শিরোধার্য করতে স্বীকৃতা ; কিন্তু বিনিময়ে আপনাদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। শর্তসাপেক্ষে আমি স্বাভাবিক পুরস্ত্রীর জীবন বিসর্জন দিতে স্বীকৃত।

—কী শর্তত্রয়?

—প্রথম শর্ত: নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হবে আমার প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের সমতুল্য।

গণ এ শর্ত এককথায় মেনে নিলেন। জনপদকল্যাণী মহারাজার সমমর্যাদাসম্পন্না, 'ফার্স্টলেডি'। দ্বিতীয় শর্তটিও ওঁরা মেনে নিলেন ;প্রতিটি অতিথি আমাকে প্রতি রাত্রের জন্য পাঁচশত কার্ষাপণ সম্মানমূল্য দিতে বাধ্য থাকবে; এবং একজন অতিথি বিদায় নিলে দ্বিতীয় জনকে আমার প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

কিন্তু তৃতীয় শর্তটি কী?

—প্রাসাদে আমার স্বনিযুক্ত প্রহরী ও সহচরী থাকবে। প্রাসাদ অভ্যন্তরে আমার আইনই প্রযোজ্য—গণ-এর কোনও এক্তিয়ার থাকবে না।

—তা কেমন করে সম্ভব? তোমার প্রাসাদে যদি কোনও অতিথি নিহত হয়? আমরা তদন্ত করে দেখতে পারব না?

—পারবেন। কিন্তু আমাকে পূর্বেই জানাবেন। আমার সম্মতিসাপেক্ষে তদন্ত হবে। অভিযোগ দাখিলের পর অন্তত সপ্ত দিবস অতিক্রান্ত হলে।

কঠিন শর্ত! কিন্তু গণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ আম্রপালী জানিয়েছিলেন সে যেমন স্বয়ম্ভু, তেমনি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারিণী। দেব-অংশে তার আবির্ভাব—শাপভ্রষ্টা সে, গণ এ শর্ত মেনে না নিলে সে আত্মবিলুপ্তিতে বাধ্য হবে। গণ-এর ইচ্ছা ছিল না এ শর্ত স্বীকার করতে ;কিন্তু কামনাজর্জর লিচ্ছবী নাগরিকদের পীড়াপীড়িতে এ শর্তটিও স্বীকৃত হল।

আম্রপালী হল বৈশালীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—বস্তুত সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন। প্রতি রজনীতে পাঁচশত কার্ষাপণ দক্ষিণা নিয়ে অচিরে সেই ধনি হয়ে উঠল বৈশালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা ধনী।

আমাদের কাহিনীর কালে—আর শুধু আমাদের 'কাহিনীর কাল' কেন, সর্বকালেই আর্যাবর্তের মানবশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শাক্যসিংহ—তিনি তখন পরিব্রাজক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সম্রাট হচ্ছেন মগধাধিপতি বিম্বিসার। গঙ্গার দক্ষিণে পাটলিপুত্র, উত্তরে বৈশালী। ভৌগোলিক দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর—তিন প্রহরের অশ্বচালনা এবং এক প্রহরে গঙ্গা-পারাপার। তবু অসীম শক্তিধর মগধাধিপতির কাছে ঐটুকু দূরত্বই দুরতিক্রম্য। হেতু: লিচ্ছবিদের সঙ্গে মগধের তখন প্রচণ্ড বিরোধ। বৈশালী নগরীতে মগধ রাজকে শনাক্ত করতে পারলে লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা ভীষ্মপর্বের শেষ দৃশ্যটির পুনরাভিনয় করে ছাড়বে!
কিন্তু শুধু সে জন্য সসাগরাধরণীর অধিশ্বর ক্ষান্ত হবেন? বিশেষ সার্থবাহ পুণ্ডরীক সেদিন যে কথা তাঁকে বলল তা শুনেও।

পুণ্ডরীক স্বনামধন্য মাগধী বণিক। কার্যোপলক্ষে সে প্রায়ই যায় বৈশালীতে। একাধিক রজনী সে যাপন করেছে আম্রপালীর প্রাসাদে। পুণ্ডরীক মহারাজের বয়স্যস্থানীয়। তাই সেবার ফিরে এসে সে অকুণ্ঠভাবে বলেছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে মগধ-সম্রাট করেননি, করেছেন সামান্য মাগধী বণিক।

সম্রাট সকৌতুকে বলেছিলেন, এ কথা হঠাৎ মনে হল কেন পুণ্ডরীক?

—নিজ অভিজ্ঞতা নেই মহারাজ, শুনেছি সিংহাসনের গদি খুব আরামদায়ক। কিন্তু আম্রপালীর উপাধানের চেয়ে নয় বোধ করি!

—আম্রপালীর শয্যার উপাধান এতই কামদার?

—আজ্ঞে না। তার পীবর-বক্ষের যুগল উপাধানের কথা বলছি, মহারাজ!

বিম্বিসার বলেন, কেন? পাটলিপুত্রের জনপদকল্যাণী জাম্ববতীর কী দোষ হল?

পুণ্ডরীক সহাস্যে বলে, সেটাও আমাকে জেনে যেতে হবে। আম্রপালী জানতে চেয়েছে।

—কী?

—সে প্রশ্ন করেছিল, পাটলিপুত্রে রসালবৃক্ষ আছে কি না। জানতে চেয়েছিল, মহারাজের প্রাসাদকাননে কি শুধুই জামের গাছ? এ কথা বলেই কৌতুকময়ী একটি পাকা জাম ছুঁড়ে মেরেছিল আপনার গায়ে।

—আমার গায়ে?

—না। মানে আপনার আলেখ্যের গায়ে। তার প্রমোদকক্ষে সমগ্র আর্যাবর্তের নৃপতিবর্গের প্রাচীরচিত্র। আপনার আলেখ্যটি তার শয্যার পদপ্রান্তে।

—পদপ্রান্তে? আমাকে অপমান করতে?

—মহারাজ, আপনি মহাভারত পড়েননি? নিদ্রাভঙ্গে সে যে বিশেষ একজনের চিত্রই দেখতে চায়।

এরপর বিম্বিসারের পক্ষে আত্মসম্বরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক অভিসার রজনীতে গোপনে তিনি ছদ্মবেশে নির্গত হলেন। কিন্তু খেয়াঘাটের সীমান্তপ্রহরী তাঁকে শনাক্ত করে ফেলল। বিম্বিসার যে তাঁর অশ্বটিকে ছদ্মবেশ পরাননি। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নৃপতির বাহনটি ছিল অশ্বকুলে উচ্চৈঃশ্রবা। সম্রাট অশ্বারোহণে যতক্ষণে উপস্থিত হলেন আম্রপালীর প্রমোদকুঞ্জে ততক্ষণে সমগ্র বৈশালী চঞ্চল। অচিরে সেই গণিকালয়টি অবরুদ্ধ করল লিচ্ছবী সেনানায়কেরা। আম্রপালী মহান অতিথির পরিচর্যার কী আয়োজন করবে স্থির করে ওঠার পূর্বেই সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ পাষাণকুট্টিমে ধ্বনিত হল: দ্বার উন্মুক্ত কর, আম্রপালিকে! তোমার প্রাসাদে তস্কর প্রবেশ করেছে।

প্রাসাদকুঞ্জের ইন্দ্রকোষের অন্তরাল থেকে আম্রপালী প্রশ্ন করে, কে তোমরা? কী চাও?

—আমরা লিচ্ছবী গণ-এর সেনাবাহিনী। সংবাদ পেয়েছি, বৈশালীর চিরশত্রু তোমার প্রাসাদ-অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে। পলাতককে সমর্পণ কর।

আম্রপালী অকুতোভয়ে বলে, গণ-এর বিচারে আম্রপালী সর্বজনভোগ্যা! সে অজাতশত্রু!

জনারণ্যের ভিতর কে যেন ব্যঙ্গ করে, অজাতশত্রু নয়। তার বাপকে চাই।

আম্রপালী বলে, গণ-অধিপতিকে বল, তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করলাম। শর্তানুসারে সপ্তদিবস অন্তে প্রাসাদ তল্লাসী করতে পার তোমরা।

সপ্তদিবস-রজনী লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা অতন্দ্র প্রহরায় বেষ্টন করে রইল গণিকার কেলিকুঞ্জ। কিন্তু ভস্ম হবার আশঙ্কায় কি মদন বিরত হয়েছিল পঞ্চশর বর্ষণে? আসন্ন সর্বনাশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দুটি নরনারী সপ্তদিবস-রজনী বিভোর হয়ে রইল। তারপর কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে সেই বেষ্টনী ভেদ করে মগধাধিপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন বিনয় পিটককার। কিন্তু ভোলেননি জানাতে যে, তিনি বৈশালীতে সেই আনন্দঘন সপ্তাহের একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে এসেছিলেন।

যথাকালে ভূমিষ্ঠ হল সেই সন্তান—পুত্রসন্তান—অভয় বা জীবক। বৈশালী তাকে সুনজরে দেখেনি। না দেখাই স্বাভাবিক—শিশুহত্যাও করেনি কিন্তু। অবজ্ঞায়, অনাদরে, শুধুমাত্র জননীর একান্ত সাহচর্যে শিশু হয়ে ওঠে বালক। পাঠশালে যায় না, গুরুগৃহে তার স্থান হবে না, গণিকালয়ের চৌহদ্দির ভিতরেই সে পৃথিবীকে চিনে নেয়।

লিচ্ছবীদের চিরশত্রুর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার অপরাধে আম্রপালী জাতিচ্যুতা—কেউই আর আসে না সেই উর্বশীবিনিন্দিতার সঙ্গসুখ কামনায়। তাতে আম্রপালী আনন্দিতা। পুরুষসিংহ বিম্বিসারের পর শিবাকুলের হুক্কাধ্বনি তার সহ্য হত না—সে যেন, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতমৎস্যের জলকেলির পর সফরির 'ফর্‌ফরায়ণ'! সে

যেন মধ্যরাত্রের দরবারী কানাড়ার পর শেষপ্রহরের ক্লান্তিকর চটুল শিবাধ্বনি।

দিন যায়। তারপর একদিন বৈশালীতে এলো গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর ভিতর দিয়ে যাত্রা করবেন। এক রাত্রি বাস করে যাবেন ঐ মহানগরীতে। মহাপরিব্রাজক তখন পরিণত বয়স্ক, সমগ্র আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। লিচ্ছবীরাজ ধন্য হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করতে থাকেন এই আশায় যে, শাক্যসিংহ সশিষ্য তাঁর প্রসাদেই আতিথ্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন 'গণ'। তারা সুশোভিত করতে থাকেন অতিথিশালাটি। আশা—মহামানব গণ-এর আতিথ্য গ্রহণ করবেন। আম্রপালী—বৈশালী নগরীর নটী—সেই যে মেয়েটি নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে উপনীত হয়েছে অসম্মানের নিম্নতম পাতালে—সে নিশ্চিত জানে, রাজপ্রাসাদই হোক, অথবা অতিথিশালাই হোক, মহামানবকে প্রণাম জানাতে সে কোথাও যেতে পারবে না। সে সব স্থলে সমাজত্যক্তার আর প্রবেশাধিকার নাই। উপেক্ষিতা হতভাগিনী রওনা হল নগরপ্রান্তে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানাতে। সঙ্গে তার কানীন পুত্র জীবক।

বৈশালী নগরসীমান্তে এক আম্রকাননে সশিষ্য অধিষ্ঠান করছেন মহাকারুণিক। এ সেই আম্রকানন, যেখানে দীর্ঘদিন পূর্বে আবির্ভূতা হয়েছিল অযোনিসম্ভবা আম্রপালী। আজ সে উদ্যান লোকে লোকারণ্য। 'লোকুত্তম' একটি পাষাণচত্বরে প্রলম্বিতপদমুদ্রায় ধ্যানস্ত। তাঁকে ঘিরে বসেছেন অযুত ভক্ত। বামদিকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ—সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ; দক্ষিণদিকে মহারাজ মহানাম এবং গণ-এর প্রতিনিধিরা। আম্রপালী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জনারণ্যের একান্তে আত্মগোপন করতে চায় ; কিন্তু ঈশ্বরদত্ত রূপই তার কাল হল। সভাস্থ সকলেই লক্ষ্য করল সেই পাপিষ্ঠাকে। কী সাহস। কানীন পুত্রটিকেও সঙ্গে করে এনেছে!

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর লোকুত্তমের ধ্যান ভঙ্গ হল। রুদ্ধশ্বাস জনতা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে। জনতার প্রথম সারি থেকে একযোগে দণ্ডায়মান হন—মহারাজ মহানাম এবং গণপ্রধান। উভয়েই যুক্তকরে কিছু নিবেদন করতে চান। কিন্তু তার পূর্বেই জনতার লক্ষ্য হল—মহাকারুণিকের করুণাঘন দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে জনারণ্যের শেষপ্রান্তে এক অন্তেবাসিনীর উপর, নির্নিমেষলোচনে যে এতক্ষণ দেখছিল মহামানবকে। শাক্যসিংহ সহাস্যে বললেন, আম্রপালীকে! বৈশালী নগরীতে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করতে চাই। তোমার সর্বতোভদ্রে আমার ঠাঁই হবে?

পরিবর্তে সভাস্থলে বজ্রপাত হলেও জনতা এমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হত না।

'সর্বতোভদ্র'। সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন। ঘৃণিত রাজনটীর গণিকালয়।

আম্রপালী উঠে দাঁড়াল। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এল। কি যেন বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল তার। নতজানু হয়ে বসে পড়ল ওঁর পদপ্রান্তে।

মহাভিক্ষু সারিপুত্ত বললেন, জীবকমাতা! ভগবান বুদ্ধ তোমার গৃহে অতিথি হতে

ইচ্ছাজ্ঞাপন করছেন। তুমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবে না?

না! পারবে না! কিছুতেই পারবে না! সেই পতিতালয়ে সে কেমন করে আহ্বান জানাবে 'লোকুত্তম'কে? হতভাগিনী তার অনিন্দ্য আননটি নামিয়ে আনে যুগলচরণে —আযৌবনের অযুত পুরুষসম্ভোগের ক্লেদ অশ্রুর বন্যায় ধৌত হয়ে গেল।

লিচ্ছবীরাজ ও 'গণ'-এর পরাজয় ঘটল আবার। সেই ঘৃণিতা দুর্বিনীতা রাজনটী —যে আশ্রয় দিয়েছিল লিচ্ছবীদের চিরশত্রুকে, যে সেই মহাপাষণ্ডের বীর্যকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে পাপের পসরা পূর্ণ করেছে, সেই কলঙ্কিনীরই জয় হল আবার।

ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য অতিথি হলেন নটীর। পিটককার বলেননি—আশ্চর্য কেন বলেননি— সে রাত্রে ভগবান বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কানীন পুত্রের জননীকে। বস্তুত কোনও উপদেশ যে দিয়েছিলেন এমনও ইঙ্গিত নেই। বোধকরি আম্রপালীর অন্তরে এমন একটি আকুতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যার জন্য মৌখিক উপদেশ ছিল বাহুল্য। বুদ্ধদেব বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপনান্তে পরদিন পুনরায় পথে বার হলেন। এমন কত কত পুরুষই তো সম্ভোগরাত্রিশেষে যাত্রা করছে প্রাসাদ ত্যাগ করে; কিন্তু এ প্রস্থান তো শুধু প্রস্থান নয়, এ যে আম্রপালীর জীবনে এক মহাভিনিষ্ক্রমণ।

বুদ্ধদেব নগরসীমা অতিক্রম করার পূর্বেই ভূলুণ্ঠিত হল রাজনটীর ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি। পীত চীবরধারিণী ভিক্ষাপাত্র হাতে তার পূর্বেই বার হল পথে —তার হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কানীনপুত্র জীবক। দুজনের যৌথ-পুকারে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বৈশালীর রাজপথঃ প্রভু বুদ্ধ লাগি, আমি ভিক্ষা মাগি—

বিম্বিসারের অভিসারে বৈশালী লাভ করেছিল একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নঃ জীবক। শাক্য সিংহের অভিনিষ্ক্রমণে বৈশালী লাভ করল আর একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন : একটি মহাসঙ্ঘারাম নগরীর কেন্দ্রস্থলে।

প্রাক্সন্ন্যাসজীবনে যে প্রাসাদের পরিচয় ছিল :

আম্রপালীর বেশ্যালয়!

সেই সর্বতোভদ্র!

যদি বলি বুদ্ধদেবের কাল থেকে কৌটিল্যের কালের ব্যবধান দু'তিনশ বছর, তাহলে সময়ের ব্যাপ্তিটাকে ঠিকমতো বোঝানো যাবে না। সে আমলের দুশ বছরের ব্যবধান সিরাজউদ্দৌলার আমল থেকে আমাদের কালের ব্যবধানের সমান নয়—অঙ্কের হিসাব যাই বলুক। শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীই তখন অগ্রসর হত মরালগতিতে— গোযানে, নৌকায়। তাই কৌটিল্যের কালেও গণিকা তথা দেবদাসীদের জীবনযাত্রা মোটামুটি বৌদ্ধযুগের অনুরূপই ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখ[redacted]নাটির আমূল পরিবর্তন করা হল। কৌটিল্য

অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বুঝে নিলেন—গণিকাবৃত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে না নিলে রাজতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি। গণিকা সমাজের 'নেসাসারি ঈভল', আবশ্যিক উৎপাত। তাকে বাদ দেওয়া চলবে না ;অথচ দেখা যাচ্ছে, তারা সমাজের উচ্চকোটির অর্থসংগ্রহ করে ক্রমশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। অর্থে এবং প্রতিপত্তিতে। আম্রপালীর প্রাসাদ রাজপ্রাসাদের সমতুল্য হয়েছিল এবং আম্রপালী তার আজীবনের সঞ্চয় দান করে গিয়েছিল বৌদ্ধ সঙ্ঘারামকে—যে অর্থ মূলত রাজতন্ত্রের। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে তাই এদিকটা বেঁধে দিলেন। সমস্ত ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে ফেললেন। গণিকাবৃত্তিকে দু ভাগে বিভক্ত করে বৃহত্তর অংশটিকেই রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। দু ভাগে নয়, তিন ভাগে।

প্রথম ভাগ—**দেবদাসী**। তাদের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র প্রায় নীরব। পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সংঘাত এড়াতে তিনি দেবদাসীদের সম্বন্ধে আদৌ কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। মন্দির-পুরোহিত তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দ্বিতীয় ভাগ—**ভূয়িশ্য**। তারা সহজিয়া—থাকবে নগরের বাহির দিয়ে। সাধারণ পণ্যা নারী যারা আপ্যায়ন করবে সাধারণ মানুষকে। স্বল্পতর মূল্যে। তাই বলে তারা আইনের আওতার বাইরে নয়। তারা তাদের মাসিক উপার্জনের ভিতর থেকে দুইদিনের রোজগার সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে। পরিবর্তে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় ভাগ—**অবরুদ্ধ**। তারা আবার দু-জাতের। একদল বিশেষ বিশেষ পরিবারভুক্ত রক্ষিতা। রাজা-শ্রেষ্ঠী-ধনকুবেররা তাদের ভরণ-পোষণ করবেন। তারা মনিবের প্রাসাদেও থাকতে পারে, অথবা বাগানবাড়িতে ; কিন্তু 'পরিবারগত সতীত্ব' তাদের মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয় দল সর্বজনভোগ্যা গণিকা বা বারাঙ্গনা। তারা সর্বতোভাবে 'সরকারী চাকুরে'। তফাত এই, তারা রিজাইন দিতে পারত না। রূপ ও গুণের বিচারে গণিকাদের তিনটি শ্রেণী। নিম্নতমদের বার্ষিক মাহিনা—শব্দটা ছিল 'ভোগ'—হাজার কার্ষাপণ।

দেবদাসী ভিন্ন অপর সকল জাতের দেহজীবিনীদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করা হল একজন অফিসারকে : গণিকাধ্যক্ষ। প্রতিটি গণিকালয়ের দায়, আয় ও ব্যয়ের হিসাব গণিকাধ্যক্ষ সরকারে দাখিল করতেন। কোন্ জাতের পতিতা তার অতিথির কাছ থেকে কী পরিমাণ নগদ অর্থ দাবি করবে তা অধ্যক্ষই স্থির করে দিতেন—এবং সে অর্থ নিশান্তে গণিকা হস্তান্তরিত করত অধ্যক্ষের প্রতিনিধিকে। ঠিক যেমন স্টেট-বাসের কন্ডাক্টার তার দৈনিক উপার্জন দিনান্তে বুঝিয়ে দেয় ডিপোয় ফিরে এসে। কিন্তু নাগর যদি অর্থের অতিরিক্ত কোনও প্রণয়োপহার দেয়—স্বর্ণালঙ্কার হলেও —তা গণিকার নিজস্ব। এবং সেটা স্বয়ং রাজাও আইনত বাজেয়াপ্ত করবার অধিকারী নন।

কৌটিল্য অতি সযত্নে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

গণিকার সন্তান হলে তার দায়দায়িত্ব সরকারের। কন্যা হলে সে হবে ভবিষ্যতের গণিকা, পুত্র হলে—কুশীলব: অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব রঙ্গশালার নট অথবা কর্মী। গণিকাদের পেনশনের ব্যবস্থা ছিল—এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। যৌবন গেলেও জীবন থাকে —এতদিন রূপোপজীবিনীদের সেই জীবনের শেষাংশ ছিল অত্যন্ত বেদনাবহ ; কৌটিল্যের কৃপায় এখন থেকে সেই অনিশ্চয়তা ঘুচল।

যদি কোনও নাগর বিশেষ কোনও গণিকাকে সাময়িকভাবে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যেতে চায়, তাতে আপত্তি নেই। সে-ক্ষেত্রে নাগরকে গণিকার মাসিক উপার্জনের সওয়াগুণ প্রতি মাসে সরকারে জমা দিতে হবে। গণিকা যদি তার এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি চায়, তাহলে তাকে চব্বিশ হাজার কার্ষাপণ মুক্তিমূল্য দিতে হবে। যে হতভাগিনীর বার্ষিক আয় তিন হাজার পণ-এর কম, তার পক্ষে এটা স্বপ্ন-কথা।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গণিকা এবং তার নাগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য চুলচেরা আইন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিবেকের বালাই ছিল না এই অর্থনীতিবিদের। রাষ্ট্রের যাতে সুবিধা সেই মোতাবেক আইন করেছেন—গণিকা ও তার নাগরের যেটুকু স্বার্থ দেখা হয়েছে, তা এই ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই। অর্থাৎ রাজতন্ত্রের স্বার্থেই। যেমন ধরুন, গণিকালয়ে মত্তাবস্থায় বা স্বেচ্ছায় যদি কোন নাগর রূপোপজীবিনীকে হত্যা করে বসে, তবে তার জরিমানা হবে বাহাত্তর হাজার পণ—অর্থাৎ মুক্তিপণের তিনগুণ।

অপরপক্ষে গণিকা যদি নাগরকে হত্য করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

জীবনের দামের 'ফারাক' হলেও গণিকার যৌবনের দাম কৌটিল্য পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছেন। যথা—শর্তানুযায়ী অর্থমূল্য গ্রহণের পরে রূপোপজীবিনী যদি চরম মুহূর্তে প্রাণিধান করে যে তার নাগর (রতিজ্ঞ—?) ব্যাধিগ্রস্ত তাহলে সে নাগরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এক্ষেত্রে সে অর্থমূল্য বা উপহার প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না। দ্বিতীয়ত নাগর যদি প্রতিশ্রুত অর্থদানে অস্বীকৃত হয় তাহলে বিচারে তাকে আটগুণ অর্থ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কানুন : গণিকা অর্থমূল্যে শুধুমাত্র সাধারণ রতিক্রিয়াতেই বাধ্য থাকবে। নাগর যদি চরম মুহূর্তে কোন প্রকার বিকৃত কামের বাসনা জ্ঞাপন করে তাহলে গণিকা তাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং অর্থমূল্য প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না।

কৌটিল্যের কাল এবং গুপ্তযুগের মাঝখানে দুটি প্রামাণ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রথমত বাৎসায়নের 'কামসূত্র' এবং দ্বিতীয়ত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। বারবণিতাদের রীতি, আচার-ব্যবহার বিষয়ে সে-দুটি মহাগ্রন্থে আলোচনা আছে। কিন্তু আমাদের তা আপাতত বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। কারণ দুটি গ্রন্থেই

বারবণিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—'দেবদাসী' নিয়ে নয়।

ভারতীয় ইতিহাসের সুবর্ণযুগ—গুপ্তযুগে পদার্পণের পূর্বে আরও একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করতে হয়—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তা সাম্প্রতিককালে অভিনীত হয়েছে। সুতরাং সে কাহিনী বিস্তারে অলমিতি হতে হচ্ছে। শুধুমাত্র উল্লেখ করব, বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের বিবাহে প্রমাণ হয় যে, সে আমলে সমাজ গণিকাদের আজকের মতো হীনদৃষ্টিতে দেখত না।

কালিদাসের মেঘদূতকাব্যে বর্ণিত উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দিরে চামর বাদনরতা দেবদাসীদের আমরা দেখেছি। পদ্মাপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে লোভ দেখানো হয়েছে—মন্দিরে যদি কেউ দেবদাসী উৎসর্গ করেন তা হলে তাঁরা ইহলোকে মহাধনী এবং পরলোকে কল্পকাল স্বর্গবাসের অধিকার পাবেন। ভবিষ্যপুরাণ সুপারিশ করছেন—সূর্যলোকপ্রাপ্তির সবচেয়ে ভালো উপায় হল, কোনও সূর্যমন্দিরে ভক্তিভরে কিছু বেশ্যা দান করা—

"বেশ্যাকদম্বকং যস্তু দদ্যাৎ সূর্যায় ভক্তিতঃ।
সগচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র তিষ্ঠতি ভানুমান্।"

কিন্তু আর তথ্য নয়। আসুন একটু গপ্পো শোনানো যাক্।

গুপ্তযুগ পর্যন্ত এসেছি। সুতরাং গুপ্তযুগের গপ্পোই ফাঁদি।

সুতনুকা আর দিবদিন্নর শাশ্বত কাহিনী :

চার

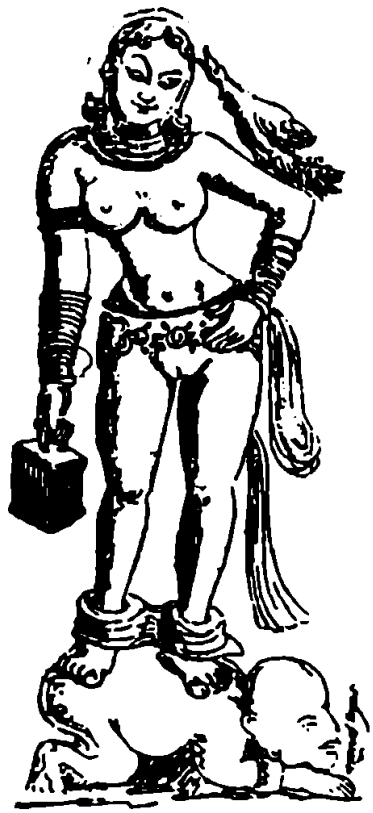

মহানগরী পাটলীপুত্র। অগ্‌গবিনতা ও রূপদক্ষের যে মৌর্যযুগীয় কাহিনীটি আমরা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি, তারপর অন্যূন সাত শতাব্দী অতিক্রান্ত। আর্যাবর্তের সবকিছুই জঙ্গম। স্থাবর শুধু ঐ মহাকালের মন্দির এবং তার নাট-মন্দিরে দেবদাসীদের ভাগ্য।

পাটলিপুত্রের কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতির আকাশচুম্বী ত্রিভূমক রাজপ্রাসাদ। দুর্গপ্রতিম সুউচ্চ প্রাসাদ প্রাকারে সারি সারি ইন্দ্রকোষ। সেখানে অতন্দ্রপ্রহরায় ধানুকী। সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথ চতুর্মুখী। তার চতুষ্পার্শ্বে নাগরিক জীবনের নানান উপকরণ। মহাক্ষ-পাটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতির ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ। চতুর্মহাপথের অন্যান্য বাহুতে অজস্র পণ্যবিপণী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপণী, সমাপানকক্ষ।

পথে বিচিত্র নরনারী। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, যানবাহন। চতুর্মহাপথের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান এক বিদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্য করছিলেন আর্যাবর্তের রাজধানীর জীবনযাত্রা। এ মহানগরীর যোষিদ্‌বৃন্দও অতি বিচিত্রা। শেন্‌সি, হোনান, চাঙয়ান —বস্তুত সমগ্র হানসাম্রাজ্যে যে রমণীদের দেখে এসেছেন আজীবন, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। এদের আননে লোধ্ররেণুর মৃদু প্রলেপ, নয়নে কজ্জল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম ও ইঙ্গুদি-তৈলের বর্ণিকাভঙ্গ, কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা।

আজন্ম ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিঙ্ জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু প্রাক্‌সন্ন্যাসজীবনে তিনি ছিলেন চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-দর্শনের অধ্যাপক।[1] সেটা পেশায়, নেশায় তিনি ছিলেন কবি। ফলে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তাঁর লক্ষ্য হলেও, তিনি সুন্দরের পূজারী। এবং সেজন্য পাটলিপুত্রে উপস্থিত হয়ে রীতিমতো সন্ধান করে বন্ধুত্ব করেছেন ভারতভূখণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিবরকে। ঘটনাচক্রে কবি তখন উজ্জয়িনীবাসী নন, আছেন পাটলিপুত্রে। বয়সের বাধা হয়নি। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণকবি এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব বৌদ্ধভিক্ষু

পরস্পরের বন্ধু। অনতিবিলম্বে যাঁর প্রতীক্ষায় কালহরণ করছিলেন, সেই বয়স্যের আবির্ভাব ঘটল। শ্যামাঙ্গ, মুণ্ডিত মস্তক, স্কন্ধে দীর্ঘ উপবীত, ললাটে শ্বেতচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। সন্ধ্যাসমাগমের স্বল্পালোকেও তাঁর শুকচঞ্চুনাসা এবং আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় পরিদৃশ্যমান। বৌদ্ধভিক্ষুর সমীপবর্তী হয়ে কবি যুক্ত করে ক্ষমা চাইলেন, পথে আমার এক বিদগ্ধ বন্ধু [2] সূর্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে এমন দুর্বোধ্য আলোচনা শুরু করলেন—

বাধা দিয়ে তাও চিঙ বলেন, সূর্যরশ্মিবিদগ্ধ আপনার বন্ধুর সিদ্ধান্ত যাই হোক সূর্যদেব এখনও অস্তমিত হননি। এমন কিছু বিলম্ব হয়নি।

অতঃপর উভয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মহাকালের হিন্দু মন্দিরটি দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন আগন্তুক। কবি পথপ্রদর্শক মাত্র। দু'-একটি ভদ্রাসনে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠেছে। শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যাদেবীর আগমনী। কবি বললেন, গোধূলিলগ্নই মন্দির-দর্শনের উপযুক্ত সময়। তখন উদ্ভিন্নযৌবনা অনিন্দ্যকান্তি দেবদাসীর দল...

সহসা গতি সংবরণ করেন ভিক্ষু। কবি বলেন, কী হল?

তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন বৃদ্ধ। বলেন, না, কিছু নয়, চলুন।

—দেবদাসীর প্রসঙ্গেই কি আপনার...?

—হ্যাঁ। প্রবজ্যা গ্রহণকালে প্রতিজ্ঞা করতে হয় : "নচ্চগীতবাদিত বিসূকদম্সনা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।"[3] কিন্তু কবিবর! এ বিষয়ে আমি আমার গুরুদেবের মতো কঠোরব্রতী নই। তুনহুয়ান গুহা মন্দিরে একদল নর্তকী দেখেছিলাম লোকুত্তমকে শ্রদ্ধা জানাতে।[4] কই, তাদের তো অশ্রদ্ধেয় মনে হয়নি।

অপ্রীতিকর আলোচনা—অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের আপাতবিরোধটি পরিহার করে কবি বললেন, আপনার গুরুদেব কে? কোথায় আছেন তিনি?

—যাঁর সঙ্গে সেই সুদূর চীনখণ্ড থেকে বুদ্ধভূমিতে এসেছি। মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন।

—তিনি বর্তমানে কোথায়?

—আপনি জানেন না? স্থানীয় মহাসঙ্ঘারামে। পাটলিপুত্রের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নাই। শুধুমাত্র যেটুকু মহাকারুণিকের স্মৃতিধন্য, তাতেই তাঁর আগ্রহ।

মহাকাল মন্দিরের সম্মুখে প্রচণ্ড জনসমাবেশ। সন্ধ্যারতির শুভলগ্ন সমাগত। এ-সময় প্রত্যহই যাত্রীদের ভিড় হয়। কিন্তু এ যে জনসমুদ্র। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। জনশ্রুতি, মহাকাল মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী রুদ্রাণীর অদ্য শেষ নৃত্যারতি। অতঃপর যতদিন না নতুন কোনও দেবদাসী ঐ রুদ্রাণীর শূন্যপদে অভিষিক্তা হচ্ছেন, ততদিন একক নৃত্যের আয়োজন বন্ধ থাকবে। বর্তমান রুদ্রাণীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চত্রিংশতিবর্ষ—অবসর গ্রহণের বয়স তাঁর হয়নি, রূপযৌবনও কানায় কানায়; কিন্তু তাঁকে অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে শূলপাণির 'কালবৈশাখী' নির্দেশে।

হয়তো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মহাকালের অন্যূন শতজন দেবাদাসী আছেন-

-ভৃত্যা-দত্তা-হৃতা-ভক্তাশ্রেণীর। অলঙ্কারা একজনই, তিনি রুদ্রাণী। দীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পূর্বে 'লাজহরণ নৃত্যে'[5] অভিষেক-অন্তে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। অভিষেক-রাত্রে সর্বালঙ্কারে ভূষিতা ষোড়শী উপস্থিত হয় নাটমন্দিরে, একবস্ত্রে। তার কণ্ঠে একটি অনতিদীর্ঘ শ্বেতমালিকা 'লাজমালিকা'; শুধু খই দিয়ে গাঁথা। এবং অলঙ্কারের যতই বাহুল্য থাক, সেই বিশেষ রাত্রে সে একবস্ত্রা। দর্শকসমাকীর্ণ নাটমন্দিরে ঐ একবস্ত্রা নর্তকীকে মৃদঙ্গের তালে তালে নাচতে হবে ; তার দেহসুষমা বিকশিত হবে, কিন্তু প্রকাশিত হয়ে পড়বে না। সে বড় কঠিন নৃত্য! তেহাই-এর তালে তালে দ্রুতচ্ছন্দ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে নাচতে হবে;আস্বচ্ছ রক্তচীনাংশুকের ভিতর দিয়ে তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গের হিন্দোল শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে অনুভূত হবে। তার যৌবন শুধু বিকশিত হবে, প্রকটিত হবে না। তারপর শেষ-সমের মাথায় যখন মৃদঙ্গ 'ধা' বলবে, তখন সে লুটিয়ে পড়বে সাষ্টাঙ্গে। প্রণতি জানাবে দেবাদিদেবকে, প্রধান পুরোহিতকে, দর্শকদের। স্বেদস্নাত নর্তকী অতঃপর ধীর পদে উঠে যাবে গর্ভগৃহে—নিজ কণ্ঠের লাজমালিকা পরিয়ে দেবে শিবলিঙ্গে। তারপর রুদ্ধ করে দেবে দ্বার—গর্ভগৃহ এবং অন্তরালের মধ্যবর্তী কবাট। বেরিয়ে আসবে একটি কাঁকনপরা হাত—তাতে তার শেষ লজ্জাবস্ত্র!

প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে সেই রক্তচীনাশুকের অঞ্চলপ্রান্তটি কর্তন করে তা দিয়ে একটি নিশান নির্মিত হবে। মন্দিরের বেতনভুক এক অন্ধ সেই নিশানটি নিয়ে উঠে যাবে বিমানশীর্ষে।[6] বাঢ়-গণ্ডী-মস্তক পার হয়ে, খাপুরি-আমলক-ঘণ্টা উত্তরণে উপনীত হবে মন্দির-শীর্ষে। নিশানটিকে অনুবিদ্ধ করবে ধ্বজাদণ্ডে।

চীনাংশুকের খণ্ড-বিখণ্ডদর্শকেরা সংগ্রহ করবে পুণ্যস্মৃতি হিসাবে। মাদুলি বন্ধনের উপযুক্ত সেই বস্ত্রখণ্ড। যাত্রী ও দর্শকদল বিদায় হলে প্রধান পুরোহিত একাকী ফিরে আসবেন মন্দিরে। সমগ্র মন্দির-চত্বর তখন নিস্তব্ধ। অন্তরালের এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিত আহ্বান করবেন: তোমার নৃত্যপূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি রুদ্রাণি। দ্বার খোল!

দ্বার খুলে যাবে। ঘৃত প্রদীপের স্তিমিত আলোকে নিরাবরণা দেবদাসী তার কৌমার্যের পশরাটুকু সম্বল করে নির্গত হয়ে আসবে অভিষিক্ত হতে।

যতদিন ধ্বজাদণ্ডে ঐ নিশানটি অক্ষত থাকবে, ততদিন রুদ্রাণীই থাকবে মন্দিরের 'অলঙ্কার'। তারপর বছরে বছরে যেমন সেই প্রধানা দেবদাসীর যৌবন তিল তিল করে ক্ষয়িত হবে, তেমনি বছরে বছরে জীর্ণ হতে থাকবে কলসদণ্ডের সেই ধ্বজানিশান।

এরপর একদিন! কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে মহাকাল স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন রুদ্রাণীর অবসর গ্রহণের কাল সমাগত। ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে সকলে অবাক হয়ে দেখবে নিশানটি অপহৃত। রুদ্রাণীর কাল শেষ। শেষনৃত্যে একবার প্রণতি জানিয়ে সে বিদায় নেবে।

এগিয়ে আসবে নতুন কালের নতুন রুদ্রাণী। সালঙ্কারা। একবস্ত্রা। কণ্ঠে দুগ্ধশুভ্র লাজমালিকা। লাজহরণ-নৃত্যের নূতন নর্তকী!

আজিকার এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির কথা জানা ছিল কবির। তিনি বিপন্ন বোধ করেন। এই জনারণ্যে তিনি কেমন করে ঐ বিশিষ্ট বিদেশীকে নিয়ে নাটমন্দিরে প্রবেশ করবেন? সহসা একটি প্রৌঢ়া ভৃত্যাশ্রেণীর দাসী অগ্রসর হয়ে আসে। কপোতহস্তে কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলে, স্বাগত ভট্ট। এদিকে আসুন।

কবি আশ্বস্ত হলেন। প্রৌঢ়া তাঁকে সনাক্ত করেছে। বিদেশী বন্ধুর করগ্রহণপূর্বক তিনি দাসীর অনুগমন করেন। চলে আসেন নাটমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে। সেটি পূর্বমুখী মন্দিরের পশ্চিমাংশ। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিপ্রভায় সেখানে এখনও কনে-দেখা-আলো। কবি সবিস্ময়ে দেখলেন একটি শোভাস্তম্ভের পাদমূলে এক অনিন্দ্যকান্তি পঞ্চদশী। সে কার উপমা? বহু কাব্যে ঐ মূর্তিটির বর্ণনা কবি নিজেই করেছেন। বোধ করি কল্পনায় এমন একটি নারীমূর্তিকে দর্শন করেই তাঁর লেখনী রচনা করেছিল : সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ!

প্রায়-কিশোরীটি তাঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে স্পর্শ বাঁচানো একটি সলজ্জ প্রণাম। ভিক্ষু তাও-চিন্তকেও প্রণাম করে। তারপর করজোড়ে নিবেদন করে, আপনারা এই পিছনের দ্বার দিয়ে নাটমন্দিরে প্রবেশ করুন নচেৎ—

কবি প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে চেন?

সলজ্জে কৌতুকময়ী প্রতিপ্রশ্নটি নিবেদন করে, কবিবরের কি ধারণা শুধুমাত্র "বিদ্যুদ্দামস্ফু রিতচকিতৈঃ" উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনা ভিন্ন আর কোন সামান্যা সাধারণী তাঁকে চেনে না?

কবি সকৌতুকে বলেন, দেবদাসীদলে তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না! সেটাও কি তুমি সামান্যা সাধারণী বলে?

মেয়েটি বলে, আমি নৃত্যের অধিকার লাভ করিনি আজও। আমার নাম সুতনুকা।

—সেটাও একটা বিস্ময়। জন্মমুহূর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে নিশ্চয়ই, কিন্তু সুতনুকা হয়েছো অনেক পরে। তবু তোমার পিতামাতা—

কনে-দেখা-আলোতেই মেয়েটিকে এবার ম্লান দেখালো। বললে, জন্মকালে আমার কী নামকরণ হয়েছিল জানি না। আমি—হৃতা। এ-নাম মন্দিরের দেওয়া।

কবিও ম্লান হয়ে গেলেন। অজ্ঞাতভাবে মেয়েটির একটি সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করে ফেলেছেন। মেয়েটি কিন্তু সেদিকে গেল না, পূর্বপ্রশ্নের বাকিটার উত্তরদান করে সে, নৃত্যের অধিকার এতদিন ছিল না, তাই আমাকে কখনও দেখেননি। তবে এবার সে-অধিকার আমি পাব। আগামী পূর্ণিমা রাত্রে। সেদিন আপনার আমন্ত্রণ রইল, কবিবর।

—নিমন্ত্রণ। কিসের নিমন্ত্রণ!

—আমাকে সরাসরি রুদ্রাণীপদে উন্নীত করা হবে সেদিন। পূর্ণিমারাত্রে আমার অভিষেক।

কবির সংবেদনশীল অন্তরে এবার মেয়েটি যেন এক তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ করে দিল। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন—সহস্র দর্শকের সম্মুখে ঐ উদ্ভিন্নযৌবনা পঞ্চদশী নৃত্যরতা—একবস্ত্রা সে—প্রতি পদক্ষেপেই সে সচকিতা হয়ে উঠছে! তারপর? লাজহরণ-নৃত্যের শেষ পর্যায়ে ঐ কাঁকনপরা হাতখানি শুধু বার হয়ে এসেছে রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে। কিন্তু তারপর? তৎক্ষণাৎ কবির মানসপটে উদিত হল—মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের কদাকার দেহটি। পঞ্চাশোর্ধ্ব লালসাজর্জর যে বৃদ্ধটি এই দেবদাসীদের সর্বময় কর্তা! ধর্মের নির্দেশে যে বর্বর অসংখ্য দেবদাসীর কৌমার্য হরণ করে এসেছে এতাবৎকাল।

সুতনুকা প্রশ্ন করে, ভট্ট কবি! আপনাকে প্রণাম করলাম, কই আপনি তো আশীর্বাদ করলেন না?

কবি তখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি। 'ধর্মের নির্দেশে,' না 'ধর্মের অজুহাতে'? না-না-না! এ হতে পারে না। মহাকালের প্রতিভূ সহস্রাক্ষ! সহস্রাব্দকালের এ-বিধান কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আশীর্বাদ করেছি, মনে মনে—

—কি সেই আশীর্বাদ? 'মা ভূ দেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ?' [7]

ভ্রূকুঞ্চন হল কবির। মেয়েটিকে একটু প্রগলভ মনে হল। একটু কঠিন শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর, তাই যদি হয়, ক্ষতি কি? তুমি তো দেবতার নির্দেশে দেবদাসী! আগামী পূর্ণিমায় রুদ্রাণী হতে চলেছ—তোমার স্বামী তো জগৎপিতা পরমেশ্বর শিব।

—আপনি ঠিক জানেন?

কবির ঐ কথাটা নিয়ে সুতনুকা পরে চিন্তা করেছে—'জন্মমুহূর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে, সুতনুকা ছিলে না নিশ্চয়?'—তা ঠিক। জন্মকালে তার কী নামকরণ হয়েছিল সুতনুকা জানে না। এটুকু শুধু শুনেছে অতি শৈশবকালে সে হৃতা। জানে না, এই প্রকাণ্ড আর্যাবর্তের কোন্ প্রান্তে, কার ঘরে সে ভূমিষ্ঠা হয়েছিল। সে কি অবন্তী, কাঞ্চি, পৌণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি? তার সেই অজানা-অচেনা জননী কি এই পঞ্চদশবর্ষ পরেও সেই অপহৃতা কন্যাটির কথা ভাবে? রাতে কাঁদে?

জ্ঞান হবার পর থেকে সে প্রত্যক্ষ করেছে এই মন্দিরের পরিবেশ। রুদ্রাণীকে পেয়েছে মায়ের মতো। কিন্তু যতই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে, ততই যেন রুদ্রাণীর সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্কটা তিক্ততর হয়েছে। ইদানীং তো সে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভিন্ন আর কিছু ভাবে না।

সুতনুকা যে পরবর্তী রুদ্রাণী এটা সকলেই জানত। সুতনুকাও! সেজন্য তাকে নানান বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা হয়েছে আবাল্য। পুষ্পমাল্য রচনা, পূজাবিধি, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও অন্যান্য চারুকলায়। অসামান্য রূপসী সে ;আর সেজন্য তাকে একটি ইতিহাস রচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে—যে ঘটনা এই মন্দির-ইতিহাসে কখনই ঘটেনি ইতিপূর্বে। কোনও দেবদাসীই কখনও 'অভিষেক-রাত্রে' সরাসরি নিযুক্তা হয়নি রুদ্রাণীর পদে। এ যেন সৈন্যদলে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাধক্ষ্যের আসন অলঙ্কৃত করা। কিন্তু সহস্রাক্ষের সেটাই ছিল পরিকল্পনা। আগামী পূর্ণিমারাত্রে ঐ উর্বশী-বিনিন্দিতা পঞ্চদশীকে অভিষিক্ত করবে সরাসরি রুদ্রাণী-পদে।

বাল্যে ও কৈশোরে এটাকে সে মহাসৌভাগ্যের দ্যোতক বলে মনে করত। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল। বয়ঃসন্ধিকালে ওর জীবনে ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল তার চিন্তাধারায়। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা মহান সত্যকে সে আবিষ্কার করে বসল। নিজেকে আবিষ্কার করল একটি মুগ্ধ তরুণের দৃষ্টির দর্পণে।

তক্ষশীলা থেকে এসেছিল এক প্রখ্যাত ভাস্কর। প্রখ্যাত, কিন্তু তরুণ। সে আজ দুই বৎসর পূর্বেকার কথা। সহস্রাক্ষ তাকে নিয়োগ করলেন মন্দিরগাত্রে কিছু মূর্তি উৎকীর্ণ করার কাজে। একের পর এক মূর্তি গড়ে যেতে থাকে ভাস্কর। তার সম্মুখে দেবদাসীদের উপস্থিত হতে হয় পর্যায়ক্রমে। শিল্পীর নির্দেশে বিচিত্র ঠামে দাঁড়াতে হয়। দেখে দেখে ভাস্কর মূর্তি গড়ে। সুতনুকা তাদের মুখে শোনে ভাস্করের কথা। কৌতূহল হয় তার। কিন্তু সে আইনানুগ দেবদাসী নয়। তার অভিষেক হয়নি, তাই পরপুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হবার অধিকার তার নাই। সহস্রাক্ষ সম্মতি দেননি। তারপর একদিন। ভোগ-মণ্ডপের গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে সে দেখল রূপদক্ষকে। আর তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দেহে যেন এক তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। ইচ্ছে হল—না। আজ আর তার মনে পড়ে না, সেই খণ্ডমুহূর্তে তার কী ইচ্ছা জেগেছিল। তবে তারপর থেকেই বারে বারে সে গোপনে লক্ষ্য করেছে উদাসীন ভাস্করকে। কটিমাত্র বস্ত্র পরিধান করে ঘর্মস্নাত রূপদক্ষ ক্রমাগত পাথরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

আশ্চর্য! সেই পরুষ আঘাতে কেমন করে প্রস্ফুটিত হয় পাষাণীবক্ষে এই কমনীয় সুষমা?

তারপর একদিন সহস্রাক্ষ অনুমতি দিলেন। জনশ্রুতি, রূপদক্ষ এবার তক্ষশীলায় প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। দুই বৎসরের পারিশ্রমিক সে দাবি করেছে সহস্রাক্ষের নিকট। এতদিন সে ঐ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল প্রধান পুরোহিতের কোষাগারে। সহস্রাক্ষ নাকি তাকেও বলেন, মন্দিরের প্রধান প্রবেশতোরণে সুতনুকার একটি মূর্তি উৎকীর্ণ করলেই তিনি রূপদক্ষর সকল অর্থ এককালীন মিটিয়ে দেবেন। দুর্জনে আরও বলে—সহস্রাক্ষ

কুশীদজীবী। তিনি ঐভাবে কিছু কালহরণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

তখনই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন। পঞ্চদশী সুতনুকা আর বিংশতিবর্ষীয় রূপদক্ষ দেবদিন্ন।

পুরোহিতের নির্দেশে রূপদক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন দাঁড়াতে হয়। মালতী থাকে পাহারায়। দেবদিন্ন মুগ্ধ। প্রথম দিন সে শুধু নয়নভরে ওকে দেখল। সম্মুখ থেকে, পাশ থেকে, পশ্চাৎ থেকে। সুতনুকা কৌতুক বোধ করে। কথা বলে না। ক্রমে দেবদিন্ন একটি প্রকাণ্ড কষ্টিপাথর নির্বাচন করল। কিন্তু মূর্তিগড়া শুরু করল না। ক্রমাগত পাষাণপটে ওর আলেখ্য এঁকে চলে। আঁকে আর মোছে। আঁকে আর মোছে। একমাস এইভাবেই অতিবাহিত হয়।

আর ধৈর্য থাকে না সুতনুকার। বলে, তুমি মূর্তি খোদাইয়ের কাজ শুরু করছ না কেন?

—ধ্যানে তোমার মূর্তিটা ধরতে পারছি না বলে।

—ধ্যান? ধ্যান কেন? আমি তো স্বয়ংই রয়েছি তোমার চর্মচক্ষুর সম্মুখে।

—তুমি জান না সুতনুকে! তোমাকে উপলক্ষ করে আমি যে মূর্তিটি সৃজন করব, তা সহস্র বৎসর পরেও দর্শককে মুগ্ধ করবে। আমার সে-মূর্তি আভাসে-ইঙ্গিতে সেকথাই বলবে, যা বলবার জন্য জগৎপিতা তোমার প্রতিটি অঙ্গ এমন কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন।

সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনলে—বিশেষ করে তরুণবয়স্ক শিল্পীর মুখে—কোন পঞ্চদশী না খুশিয়াল হয়ে উঠে? সুতনুকা সকৌতুকে জানতে চায়, কী বলবে সে?

—বলবে, এই মরণশীল জগতে আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করার মন্ত্রটি পেয়েছি।

কৌতূহলী মেয়েটি বলে, তা কেমন করে সম্ভব?

রূপদক্ষ তখন বুঝিয়ে বলতে থাকে তার শিল্প-পরিকল্পনার মর্মার্থ।

সুতনুকাকে আদর্শ করে সৃষ্টি করবে এক যক্ষিণীর মর্মরমূর্তি। তার পদতলে মৃত্যু-অসুর পিষ্ট হচ্ছে—যক্ষিণী মৃত্যুঞ্জয়ী। না ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুকে সে জয় করেনি--সেও তোমার-আমার মতই মরণশীলা। লক্ষ্য করে দেখ না ওর চরণের অলঙ্কারটিকে। ওটা তো একজোড়া নূপুর নয়—ওটা শৃঙ্খল। পরাজিত মৃত্যু-অসুর ওকে স্থাবর করে রেখে তবে প্রাণ দিয়েছে। যাতে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে না পারে। তা হোক, তবু দার্শনিক বার্গসঁ যাকে বলেছেন, জীববিবর্তনের পথে 'অমৃত'— Elan Vital, সেই অমৃতের অধিকারিণী হয়েছে ঐ চলচ্ছক্তিহীনা শৃঙ্খলিতা মুক্তা মেয়েটি। ব্যক্তিগত নয়, প্রজাতিগত জীবনে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। তুমি-আমি মরব, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নূতন জীবনও যাব সৃষ্টি করে। মৃত্যুর কাছে প্রজাতিগতভাবে মানুষ হার মানবে না। যৌবনের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে তাই ঐ সুতনুকা ঘোষণা করছে নন্দনতত্ত্বের মূল

কথা,— প্রজনন তত্ত্বের কথা। মৃত্যু যদি হয় মরণশীল দুনিয়ার শেষ কথা, তবে সে ঘোষণা করবে নন্দনতত্ত্বে প্রজাতিগত শেষতর কথা! ওর দক্ষিণ হস্তে থাকবে একটি পিঞ্জর— কিন্তু মৃত্যু যেভাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শৃঙ্খলিত করেছে, সে সেভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ করবে না তার দয়িতকে। ও জানে পিঞ্জর নিষ্প্রয়োজন—প্রেমের অচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধনে ওর পোষা শুকপাখি ওকে সোহাগ জানাবেই। মৃত্যু যদি হয় মরজীবনের অন্তরস, তবে ঐ রসিকা সন্ধান দেবে অ-মরজীবনের আদিরসের।

না, এ ভাষায় বলেনি। এ ব্যাখ্যাও দেয়নি।[৪] সে কি বলেছিল আর সুতনুকা কী বুঝেছিল তাও জানি না। তবে এটুকু সুতনুকা উপলব্ধি করেছিল—সে ঐ রূপদক্ষকে ভালবেসে ফেলেছে। বিহ্বলভাবে সে শুধু জানতে চায়, তাহলে সে মূর্তি নির্মাণ শুরু করছ না কেন?

—কেমন করে করব? তোমার সেই বাধাবন্ধনহীন মৃত্যুঞ্জয়ী মূর্তিটা যে আমার ধ্যানে ধরা দিচ্ছে না।

—বাধাবন্ধনহীন।—প্রশ্ন নয় ;এটা সুতনুকার কণ্ঠনিঃসৃত একটি আত্মজিজ্ঞাসা। কিন্তু দেবদিন্ন মনে করল এটি প্রশ্নবোধক। তাই ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ লাজহরণনৃত্যান্তে যে দৃশ্যটা সহস্রাক্ষ তার সহস্র নয়ন মেলে দেখবে, আমাকে সেটাই দেখতে হবে,—ধ্যানে।

এর পরের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বেদনাবহ। সুতনুকা আজও জানে না কেন সে অমন দুঃসাহসিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রূপদক্ষকে। সে কি শিল্পের অনুরোধে? একটি মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণায়? নাকি শিল্পীকে তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে? অথবা— স্বীকার করতে লজ্জা হয়, সেকি নিজেই চেয়েছিল একটি মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির সম্মুখে নিরাবরণা ফোটা কদমের মতো আনন্দ-শিহরণে রোমঞ্চিততনু হতে। কিন্তু পারেনি! সহস্রাক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হতভাগিনী চরম মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়!

প্রাক্-অভিষেক দেবদাসীর অসূর্যম্পশ্যা অনাঘ্রাতা সৌন্দর্য মর-মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হওয়া শুধু অপরাধ নয়, পাপ! সে দেবতার সম্পত্তি! যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রের বঙ্কিম পথে সে-তীর্থে উপনীত হওয়ার একমাত্র অধিকারী প্রধান পুরোহিত। সহস্রাক্ষের পুরোহিত তন্ত্রের এই নির্দেশ। যে নির্দেশ স্বয়ং রাজা অবনতমস্তকে স্বীকার করেন। দেবদিন্নকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়ন করল সহস্রাক্ষ। বলা বাহুল্য, তার প্রাপ্য অর্থ বাজেয়াপ্ত করে। দুর্জনে এও বলে যে, সমস্ত ঘটনাপরম্পরাই সহস্রাক্ষের সুচতুর পরিকল্পনা অনুযায়ী!

বন্দিনী হয়ে রইল সুতনুকা লাজহরণ-নৃত্যের প্রতীক্ষায়।

সুতনুকার ঐ কথাটা নিয়ে কবিও পরে চিন্তা করেছেন : আপনি ঠিক জানেন?

না, কবি জানেন না। স্বীকার্য, এই ব্যবস্থাটা সহস্রাব্দিকাল সমাজ মেনে এসেছে।

মেনে এসেছেন রাজেন্দ্রবর্গ, মেনে এসেছে 'গণ', মেনেছে পঞ্চায়েত, 'সভা', 'সমিতি'। এবং আজ পর্যন্ত কোনও জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত এ নিয়ে প্রতিবাদ করেননি। ঋষি ভার্গব, মনু, বাৎস্যায়ন, ভরত, কেউই বলেননি— কোন্ যুক্তিতে ঐ অনাঘ্রাতাকে বলি দিতে হবে তার পিতার বয়সী এক কামার্ত বৃদ্ধের লালসা-যূপকাষ্ঠে?

এমনিতেই পক্ষকাল ধরে একটি মর্মপীড়াদায়ক চিন্তা তাঁর রাত্রের নিদ্রা হরণ করছে। তাঁর সদ্যসমাপ্ত কাব্যটি শ্রবণ করে মগধাধিপতি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন—কাব্যটি সুসমাপ্ত নয়। নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিয়েছেন তিনি সপ্তম সর্গে। কিন্তু মহারাজ বলেছেন, কাব্যে নামভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হবার কথা তিনিই তো এখনও অনাগত। বিবাহেই কখনও শেষ হতে পারে মিলনাত্মক কাব্য? তার পরের অধ্যায়? কবিকে 'অষ্টম সর্গ' রচনা করতে হবেই।

কবি বিভ্রান্ত। জগৎপিতা এবং জগন্মাতার দৈহিক সঙ্গম কি সন্তান বর্ণনা করতে পারে? তাঁরা যে বাগর্থের মতো সর্বদাই সম্পৃক্ত।

মস্যাধার ও ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিয়ে কবি দ্বিপ্রহরেই বসেছেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। একটি প্রহর সমংকায়শিরগ্রিব হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন—একটিমাত্র পংক্তিও রচনা করা হয়নি। মনের দ্বন্দ্ব অপনোদিত হচ্ছে না। রাজাদেশে তিনি প্রাণ দিতে পারেন —কিন্তু কাব্যসরস্বতীকে লাজহরণ-নৃত্যের আসরে নামাতে পারেন না। এই মানসিক অবস্থায় সুতনুকার ঐ মারাত্মক প্রশ্নটি তাঁকে ব্যাকুলতর করে তুলল: আপনি ঠিক জানেন?

সন্ধ্যা সমাগতা। দূর থেকে ভেসে আসছে মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির রেশ। দিবালোক মিলিয়ে আসছে। রচনা করতে হলে এইবার ওঁকে গাত্রোত্থান করতেহয়— ঘৃত প্রদীপটি প্রজ্বলিত করতে হয়।

কবি গাত্রোত্থান করেই সচকিত হয়ে ওঠেন। উন্মুক্ত দ্বারপথে একজন পূর্ণযৌবনা রূপসী পূর্বমুহূর্তেই প্রবেশ করেছে সেই নির্জন গৃহে। কবির দিকে পিছন ফিরে সে গৃহদ্বারে অর্গল বন্ধ করতে উদ্যতা। কবি স্তম্ভিত। পরমুহূর্তে রমণী কবির মুখোমুখি হলেন। অবগুণ্ঠন অপসারিত করে বলেন, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, ভট্ট। আমি আপনার শরণাগতা, সাহায্যভিক্ষার্থিনী।

—আপনি তো....আপনি তো মহাকাল মন্দিরের রুদ্রাণী?

—ছিলাম। গতকল্য পর্যন্ত সেটাই ছিল আমার সামাজিক পরিচয়। কিন্তু কবির কাছে আমি আজ আর একটু স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছুক। আমি মায়ের জাত।

কবি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এই নির্জন রুদ্ধদ্বারকক্ষে নৈশ অভিসারিকাকে কী-ই বা বলা যায়? ইতস্তত করে শুধু বলেন, এখানে আমি সম্পূর্ণ একাকী—কল্য প্রাতে আমি যদি মন্দিরে উপস্থিত হই?

—না। সর্বত্রই সহস্রাক্ষের চর! এখানেই! এই মুহূর্তেই.....

বিনা আপ্যায়নেই আগন্তুকা ভূমিতলে উপবিষ্টা হন। সময় অল্প, পরিবেশও অনুকূল নয়, তবু স্বল্পভাষে রুদ্রাণী উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁর মাতৃহৃদয়।

রুদ্রাণী আজ দুই দশক মহাকাল মন্দিরের 'অলঙ্কারা', শ্রেষ্ঠা নটী। তার পূর্বে আরও এক-দশক তিনি বন্দিনী ছিলেন শিক্ষার্থীরূপে। দেহ মনের নিদারুণ অপমানে তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জেনেছেন—দেবদাসী-জীবনের অভিশাপকে। বহুভোগ্যার বিড়ম্বিত জীবনের সে কী নিদারুণ তিক্ততা! —ওরা স্বামী পায় না, সন্তান পায় না, শুধু ধর্মের অজুহাতে অযুত অজানা পুরুষকে দেহদান করে যায়। পুরোহিত-শ্রেষ্ঠী-বণিক-রাজা! প্রত্যক্ষজ্ঞানে তিনি জেনেছেন—দেবতা দেবদাসীর সেবা আদৌ চান না ;এ শুধু একদল কামার্ত ষড়যন্ত্রকারীর যৌথ প্রচেষ্টায় নারীদেহরিরংসার আয়োজন। পুরোহিততন্ত্র আর রাজতন্ত্র পরস্পরের সহায়। সমাজ নির্বাক। সাশ্রুনয়নে বললেন, কবি, সুতনুকাকে আমি গর্ভে ধারণ করিনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তার মা! অথচ কী পঙ্কিল পরিবেশ দেখুন—সে ইদানীং আমাকে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ভূমিকায় দেখে!

কবি সচকিত হয়ে বলেন, এসব কথা আমাকে কেন?

—দেবদিন্ন কোথায় আত্মগোপন করে আছে আমি জানি। সহস্রাক্ষের লালসাবহ্নি থেকে আমি ঐ অপাপবিদ্ধাকে উদ্ধার করতে চাই। কবি, সমস্ত জীবন ধর্মের নামে পাপাচার করেছি, আজ অধর্মের নামে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে চাই। তাই এসেছি আপনার কাছে।

—কিন্তু আমি দীন কবি, আমার কাছে কেন?

—'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। [9]

একথার জবাব নেই। কবি চিন্তান্বিত হলেন। রুদ্রাণী বলে চলেন, শুনেছি ভিক্ষু ফা-হিয়েন আজ নিশাবসানে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে তাম্রলিপ্তির পথে যাত্রা করবেন। ভিক্ষু তাও-চিঙ্ আপনার বন্ধু। পলাতক কপোত-কপোতিকেযাতে ওঁদের অর্ণবপোতে আশ্রয় দেওয়া যায়, সেটুকু আপনাকে করে দিতে হবে। রাত্রের শেষযামে আমি স্বয়ং ওদের নৌকায় পৌঁছে দেব। সহস্রাক্ষ সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য তন্ন-তন্ন করে তল্লাশী করবে। কিন্তু মহাভিক্ষু ফা-হিয়েনের অর্ণবপোতে সে তল্লাশী করতে সাহস পাবে না।

মুহূর্তকাল কী-যেন চিন্তা করলেন কবি। মহাকালের মন্দির থেকে ভেসে এল একটা শঙ্খনির্ঘোষ। সহস্রক-ব্যাপী একটা সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করে কবি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এটা কি সম্ভব? ঐ শঙ্খনির্ঘোষে পিনাকপাণি যেন সায় দিলেন রুদ্রাণীর আকূতিকে। কবির মুখমণ্ডল যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যুক্তকরে বললেন, ভগবতি। যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিস্যে।

পাটলিপুত্র মহাসঙ্ঘারাম থেকে যখন ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন কবি তখন মধ্যরাত্রি। সমস্ত নগরী তখন সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। জেগে ছিলেন ব্যর্থকাম পরাভূত এক কবি! এতবড় আঘাত জীবনে ক্বচিৎ পেয়েছেন। কল্পনাই করতে পারেননি, এমন একটি সত্য-শিব-সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখাত হতে পারে। কিন্তু তাই হয়েছিল। বন্ধুবর ভিক্ষু তাও-চিঙ্-এর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ফা-হিয়েন ছিলেন তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি নাকি ন্যায়ত-ধর্মত বাধ্য। প্রথমত এটি চৌরকার্য, দ্বিতীয়ত হিন্দুধর্মদ্রোহিতা, তৃতীয়ত এতে 'মার'এর জয় এবং সর্বোপরি সুতনুকা গৃহস্থঘরের অনূঢ়া কন্যা নয়—সে দেহোপজীবিনী শ্রেণীভুক্তা। নিতান্ত ঘৃণার্হা।

রুদ্রাণীকে দুঃসংবাদটা জ্ঞাপন করবার সময় ও সুযোগ নাই। সমস্ত রাত্রি নির্জন রাজপথে পদচারণা করেছেন কবি। ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। গঙ্গাতীরে পাষাণ রাণায় পদ্মাসনে বসলেন অবশেষে। লক্ষ্য হল, সন্ধ্যাকালে যে বৃশ্চিকরাশির চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে দেখেছিলেন পূর্বগগনে সে নিশ্চিহ্ন হল পশ্চিম দিগন্তে। জিজ্ঞাসা অস্তমিত, কিন্তু উত্তর কোথায়?

গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোত। মধুকর, সপ্তডিঙ্গা, খরসান, ময়ূরপঙ্খী। তদ্ভিন্ন স্থানীয় কিছু ক্ষুদ্রতর জলযানও ভাসমান—ডিঙি, দ্রোণা, পানসি, বালান, মান্দাস। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীতধ্বজাবাহী বিশাল অর্ণবপোতটি সহজেই সনাক্ত করা যায়। স্থির করলেন, এখানেই অপেক্ষা করবেন সূর্যোদয় পর্যন্ত। রুদ্রাণী এখনই আসবে পলাতক প্রেমিকযুগলকে নিয়ে; তার কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদটি জ্ঞাপনান্তে ব্যর্থতার তিরস্কার নতমস্তকে গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন।

ক্রমে পূর্বগগন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গের কলকাকলীতে গঙ্গাতীর মুখরিত। কবি ধীরপদে ফা-হিয়েনের জলযান অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে কর্মচাঞ্চল্য লক্ষণীয়—যাত্রার প্রস্তুতি।

কবিকে প্রথম দেখতে পেলেন ভিক্ষু তাও-চিঙ্। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এসে তিনি কবির করগ্রহণ করে বলেন, কবি! কোথায় ছিলেন সমস্ত রাত্রি? সঙ্ঘারাম থেকে নির্গত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আপনি তো গৃহে প্রত্যাগমন করেননি।

—না, করিনি। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি যে প্রহরে প্রহরে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি।

—কিন্তু কেন? কী হয়েছে?

—মহাকারুণিক করুণা করেছেন! মহা-অর্হৎ মত পরিবর্তন করেছেন। সম্মত হয়েছেন।

—জয় শঙ্কর! তাহলে ওরা কোথায়?

—অর্ণবপোতের গোপন কক্ষে। রুদ্রাণী ওদের পৌঁছে দিয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন

করেছেন। আমরা এখনই যাত্রা করব। শুধু আপনাকেই সংবাদটা.....

—একবার তাহলে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন।

কিন্তু তার পূর্বেই অগ্রসর হয়ে আসেন মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন!

কবি তাঁকে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কবিকে তাঁর পঞ্জরসর্বস্ব বুকে টেনে নিলেন।

বললেন, কবিবর! তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন করেছ। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে মনটা বড় চঞ্চল হল। আমি থেরীগাথা[10] গ্রন্থের সূত্রগুলি আবৃত্তি করতে উদ্যত হলাম। তুমি নিশ্চয় জান, তার প্রথম কবিতাটি মহাভিক্ষুণী আম্রপালীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সে গ্রন্থ আমার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! একটি শ্লোকও আমার স্মরণে এল না। অবসন্নচিত্তে শয্যাগ্রহণমাত্র অগ্‌গসেবিকা আম্রপালী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। স্বপ্নে মাতা আম্রপালী আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "কুঙ্গ![11] থেরীগাথা আবৃত্তির অধিকার তুমি হারিয়েছ। কানীন পুত্রকে প্রত্যক্ষ করেও মহাকারুণিক আমার সেই পাপালয়কে বলেছিলেন: 'সর্বতোভদ্র'; আর তুমি সুতনুকাকে প্রত্যক্ষ না করেই তাকে পাপিষ্ঠা বলেছ। মাতৃজাতির অপমান করেছ তুমি।"—

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল আমার।

ভিক্ষু তাও-চিঙ্‌কে প্রেরণ করলাম তোমার সন্ধানে।

ওঁরা তিনজনে প্রবেশ করলেন অর্ণবপোতের গর্ভে। নবদম্পতি যুগলে প্রণাম করল ওঁদের তিনজনকে। দেবদিন্নকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে কবি বললেন, রূপদক্ষ! তোমার সেই যক্ষিণী মূর্তিটি যুগযুগান্তকাল মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী প্রচার করবে—এই আশীর্বাদ করি।

সুতনুকা প্রণামান্তে প্রশ্ন করে, আর আমাকে? কী আশীর্বাদ করবেন?

কবি সকৌতুকে বলেন, তোমাকে তো সেদিনই আশীর্বাদ করেছি সুতনুকে! "মা ভূদেবং..."! কিন্তু আজ শুধু সে কথা নয়। ঐ দেখ সূর্য উঠছে, তাই বরং পরামর্শ দিই—

'চক্রবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং উবট্ ঠিআ রত্তনী!'[12]

বালার্ক সূর্যের আভায় —নাকি লজ্জায়—রক্তিম হয়ে ওঠে সুতনুকার গণ্ডদ্বয়।

কবি প্রেমিকযুগলের দুটি হাত একত্র করে বললেন, গঙ্গাবক্ষে, ব্রাহ্মণের বিধানে এ তোমাদের গান্ধর্ববিবাহ! এ মিলন সার্থক হোক। শিল্পীর বীর্যে আর সুতনুকার মাতৃস্নেহে জন্ম নেবে সেই 'কুমার'—যে এই আসুরিক প্রথার অবসান ঘটাবে।

সুতনুকা অস্ফুটে যেন আপনমনে শুধু বললে, আপনি ঠিক জানেন?

কাহিনী আমার শেষ হয়েছে। বাকি আছে সামান্য উপসংহার।

কবির বাণী ব্যর্থ হয়নি। মহাজনক মহিষী সীবলীর তপস্যা যেমন বহু জন্ম অতিক্রম

করে সার্থক হয়েছিল রাহুলজননীর দাম্পত্য-জীবনে, তেমনি বহু জন্ম পরে—কে জানে হয়তো ঐ সুতনুকা-দেবদিন্নের বংশেই—জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যে ডক্টর মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি। বলতে গেলে যাঁর একক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল দেবদাসী প্রথা।

কিন্তু সে সব কথা এখন নয়। অনেক পরে। আমরা এখনও আছি গুপ্তযুগে। তাই আজ আমি শুধু শোনাব সেই বিশেষ দিনটির কথা। মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন আর কবি কালিদাসের স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রত্যুষের কথা।

ফা-হিয়েনের অর্ণবপোত গঙ্গার বাঁকে বিলীন হয়ে গেলে কবি গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তাঁর চিহ্নিত অজিনাসনে বসলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

এতক্ষণে তিনি বৃশ্চিকরাশির সেই জিজ্ঞাসার উত্তরটা খুঁজে পেয়েছেন। একটি প্রশ্নের ভিতর দিয়ে। সুতনুকার সেই আকুল অসতর্ক স্বগতোক্তি থেকে—

'আপনি ঠিক জানেন?'

না! কবি ঠিক জানেন না। স্বীকার করতে তিনি বাধ্য—গঙ্গাবক্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে গান্ধর্ব বিবাহেই ঐ মিলনান্তক কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটেনি। নৌকা চলেছে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু সহস্রাক্ষ এবং নগরকোট্টালের তল্লাশীবাহিনীও দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। অর্ণবপোত একদিন উপনীত হবে তাম্রলিপ্তি বন্দরে—সেই যেখানে নদী বিলীন হবে সাগরে। সার্থক হবে মহাসঙ্গমে।

কিন্তু সুতনুকা কি বিলীন হতে পারবে আর এক মহাসঙ্গমে?

তারকাসুর যে এখনও পদাঘাতে প্রকম্পিত করছে পৃথিবীকে।

'কুমার' অজাত!

শুধু 'ইচ্ছে হয়ে' লুক্কায়িত আছে সুতনুকার মাতৃহৃদয়ে।

না! স্বীকার্য : কাব্য এখনও শেষ হয়নি!

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা এ অধম সন্তানের ধৃষ্টতা মার্জনা কর।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে কবি লেখনী উদ্যত করলেন :

।। অষ্টম সর্গ ঃ ।।

"পাণিপীড়ণবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহির্তুহরং প্রতি—" 13

পাঁচ

সূতনুকা নয়, এবার দেবদিম্নর কথা কিছু আলোচনা করা যাক।

মানুষ নারীজাতিকে প্রথম চেনে মায়ের রূপে। দেশকাল নিরপেক্ষভাবে প্রথম জ্ঞানোদয় হতেই সে দেখতে পায় স্তনদায়িনী জননীকে। তার ক্ষুদ্রজীবন জননীকেন্দ্রিক। সে আর কিছু চেনে না। ক্রমে তার বয়স বাড়ে। দেহে মনে। তার দেহে পরিবর্তন আসে ; সে লক্ষ্য করে সমবয়সী মেয়েদের দেহেও ঘটতে থাকে অনুরূপ রূপান্তর। একদিন তার দৃষ্টির বদল হয়, নারীকে জননী নয়—জায়া রূপে দেখতে শেখে। 'ম্যাডোনা' রূপান্তরিত হয় 'ভেনাস'-এ।

বিশ্বভাস্করের ক্ষেত্রেও ঘটেছে অনুরূপ বিবর্তন।

বিশ্বশিল্পচেতনার উষাযুগে—প্রাগৈতিহাসিক কালে—নারীকে শিল্পী প্রথম দেখেছে মায়ের রূপে। মাতৃত্বের দিকটাই সে আমলে সে ফুটিয়ে তুলেছে। তারপর যেহেতু সে শিল্পী, তাই মাতৃত্ব সত্তাকে সে আরোপ করেছে অন্যান্য দিকে—যা কিছু তার মায়ের মতো। জননী দেন স্তন্যসুধা, ধরিত্রী দেন শস্য ; ফলে ধরিত্রীদেবীতে সে মাতৃত্বগুণ অরোপ করল। গাভী জননীর বিকল্প—তাই তাকে গোমাতারূপে চিহ্নিত করল হিন্দু। এই যে বিবর্তন—'ম্যাডোনা'র ধারণা থেকে 'ভেনাস'-এর পরিকল্পনা—এটা অনুধাবন করতে মানবসভ্যতার প্রথম পর্যায় থেকে খানকয়েক চিত্র পেশ করা যাক।

প্রাচীনতম চিত্রটির নাম 'ভেনাস্ অব উইলেনডর্ফ'। বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথমে তার একটি রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করেছি। চুনাপাথরের তৈরী এই ছোট্ট মূর্তিটি (১০ সেমি.উঁচু) বর্তমান অস্ট্রিয়া অঞ্চলের জনৈক অজ্ঞাতনামা ভাস্কর রূপায়িত করেছিল, আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগে। অর্থাৎ মানুষ নামক জন্তু যখন শিকার এবং ফলমূল আহরণ ছেড়ে চাষবাসে সবে মন দিচ্ছে, গৃহপালিত পশুর সাহায্যে জীবনযাত্রা সরল করছে। নামে যদিচ 'ভেনাস', নারীমূর্তিটি নিঃসন্দেহে আসন্ন জননীর। 'অ্যানান্‌সেশন'-এর।

দ্বিতীয় উদাহরণটিও প্রাচীন প্রস্তর যুগের—প্রায় বিশ হাজার বছরের পুরাতন।

এক্ষেত্রে 'স্তোকনম্রা স্তন' ও গুরুনিতম্বে মাতৃত্বের ব্যঞ্জনা। এই জাতীয় মাতৃমূর্তি বর্তমান যুগের ভাস্করও বানায়। প্রথম দুটি উদাহরণে মুখমণ্ডলে বাস্তবানুগ রূপারোপের কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি। মাতৃত্বভাবের জন্য বোধ করি তা ছিল নিষ্প্রয়োজন।

এবার তৃতীয় উদাহরণটি (পৃষ্ঠা-২৪) লক্ষ্য করুন।। এটি প্রায় বিশ হাজার বৎসর পূর্বেকার। এবারে শিল্পী নারীমূর্তির সর্বাবয়ব খোদাই করেননি, করেছেন শুধু মুখখানি। এ মূর্তি 'মাদোনার' নয় 'ভেনাস'-এর। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতেরা[1] বলেন, এইটিই পৃথিবীর আদিমতম 'পোট্রেচার'—বাস্তব নারীমূর্তির অনুকরণের প্রচেষ্টা: প্রতিকৃতি। আরও লক্ষণীয়—প্রথম মূর্তিটি ছিল চুনাপাথরের, দ্বিতীয়টি পোড়ামাটির, কিন্তু এটি হচ্ছে হাতির দাঁতের। অধরোষ্ঠ খোদাই করা হয়নি, কিন্তু চোখ নাক, ঢেউখেলানো চুল এবং দীর্ঘায়ত গ্রীবা (আপনার কি রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত লাবণ্যের গ্রীবার কথা মনে পড়ছে? আমার কিন্তু মনে পড়ছে কোরাজ্জিওর—'ম্যাডোনা অব দ্য লঙ-নেক') অষ্টাদশী তরুণীকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করেছে। বিশ্বের শিল্প ইতিহাসে দেবদিম্ন এই প্রথম সূতনুকার সন্ধান পেল।

চতুর্থ উদাহরণে আমরা অনেক অনেক বছর এগিয়ে এসেছি। মাত্র তিন হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের এ নারীমূর্তিটি খোদাই করেছেন নীল নদের অববাহিকায় কোনও মিশরীয় ভাস্কর। এটি 'ভেনাস' নয় 'মাদোনার'। শিল্পী সেখানে স্ত্রীমূর্তির নাভিমূলের নিচে অনেকগুলি ছিদ্র করে বলতে চেয়েছেন—মহিলাটি বহুবার গর্ভধারণ করেছেন।

মেসপোটোমিয়ায় প্রাপ্ত (আঃ ২০০০ খ্রীঃ-পূঃ) পরবর্তী এই রমণী-মূর্তি জননী ও নর্মসহচরীর মাঝামাঝি। বোধ করি এর জননীত্বের চেয়ে নারী সৌন্দর্যটাই বেশি প্রকট। তাই —চোখ-নাক-মুখ সব কিছুই খোদাই করা হয়েছে।

সিরিয়া থেকে সংগৃহীত উদাহরণে (আঃ ১৫০০খ্রীঃ পূঃ)দেখছি শিল্পী মাতৃত্বের অনুভাবনাটির সঙ্গে মাতা ধরিত্রীকে একাত্ম করেছেন। মাতৃদেবী এতদিনে একটি পরিধেয় বস্ত্রে সুশোভিতা ; তাঁর কণ্ঠে ও কপালে রত্নহার ; এবং তাঁর দুই হাতে শস্য।

ভারতবর্ষীয় শিল্পীর ক্ষেত্রেও নারীসত্ত্বার সম্বন্ধে ধারণাটি একই পথে বিবর্তিত হয়েছে। মহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত আদিম পুরুষ ও স্ত্রীর মূর্তি নির্মিত হত প্রতীকচিহ্নরূপে, যথাক্রমে লিঙ্গপ্রতিকী দণ্ডএবং আংটির মতো ছিদ্র-সমন্বিত স্ত্রীপ্রতিকী। অচিরেই ভারতীয় ভাস্কর জননী ও রমণীর একটি সমন্বয় করতে চাইল। কোথাও এঁর পাল্লা ভারী, কোথাও ওঁর। মোহেন-জো-দাড়োর বিখ্যাত ব্রোঞ্জের নারীমূর্তিতে জননীত্ব প্রায় অনুপস্থিত। অলঙ্কার ভারাক্রান্ত এ নর্তকী শুধু কামনার ধন। অপরপক্ষে বিহার প্রদেশের চম্পারণ জেলায় 'লাউড়িয়া' গ্রামে প্রাপ্তা নারী মূর্তিটি জননীর প্রতীক। নারীত্বের এই দ্বি-ধারা গঙ্গা যমুনার মতো সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে আর্যাবর্তে।

নীলনদ অববাহিকায় প্রাপ্ত এ মাতৃমূর্তিটি তিন হাজার খ্রীঃ-পূর্বাব্দের। মিশরীয় ভাস্কর মাতৃজঠরে ছিদ্র দেখিয়ে বলতে চান— জননী বহুবার গর্ভ ধারণ করেছেন।

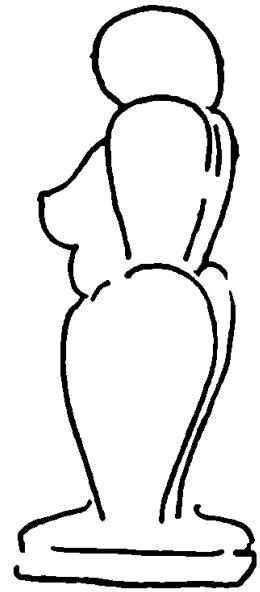

প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বেকার এ জননী মূর্তিতে মুখচোখ গড়া হয়নি। স্তোকনম্র স্তন ও গুরু নিতম্বে মাতৃত্বের ব্যঞ্জনা। এটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য।

সিরিয়ায় প্রাপ্ত (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ-পূঃ) এই জননীমূর্তি ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তিনি সালঙ্কারা, সবস্ত্রা এবং শস্যদায়িনী। লক্ষণীয় এই প্রথম আমরা 'প্রোকাইল' পেলাম, আমাদের আলোচ্য উদাহরণগুলিতে।

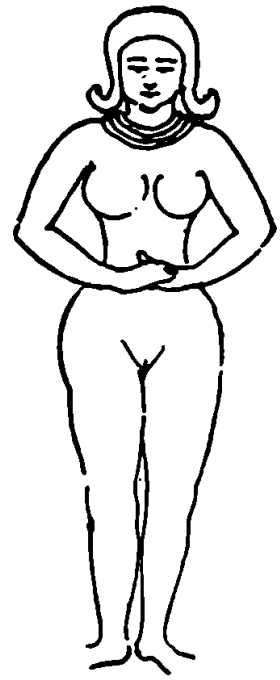

মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত (আঃ ২০০০ খ্রীঃ-পূঃ) এ মূর্তিতে নাকমুখ, চোখ ও অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছি। 'মাদেনা' থেকে 'তেনাস'-এ উত্তরণে এ একটি সোপান।

* * *

দেবদাসী প্রসঙ্গে ইদানীংকালে যা কিছু লেখা হয়েছে—অর্থাৎ আমার সীমিতজ্ঞানে বাঙলা ইংরাজীতে যে কয়খানি বই পড়েছি, সকলেই এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ অধিকারের পরবর্তী যুগে এ প্রথা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে নিন্দা ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে যে ব্যবস্থাটি ছিল তা কি শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্ন? রূপালীরেখা কি কোথাও নজরে পড়ে না? তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র জীবনধারণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, অভিভাবকহীনা পূর্ণযৌবনা নারী অনেক সময় স্বেচ্ছায় এসে আশ্রয়ভিক্ষা করত মন্দিরে। কখনও বা অতি দীন পরিবারের অভিভাবক কন্যাকে পাত্রস্থ করা অসম্ভব বিবেচনা করে মেয়েটিকে মন্দিরে উৎসর্গ করে আসতেন। উভয় ক্ষেত্রেই দেবতার আশ্রয় না পেলে ঐ মেয়েদের পতিতালয় ভিন্ন যাবার কোনও পথ ছিল না। নিঃসন্দেহে পতিতালয়ের অপেক্ষা মন্দির কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে জীবনধারণই অনেক বেশী কাম্য; এমনকি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সীমিত পরিবেশে মেয়েটি দেহদানে বাধ্য হলেও। এই সব বস্তুতান্ত্রিক দিক নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আর একটি তাত্ত্বিক দিকের কথা বলি :

রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে একবার দিলীপকুমারকে বলেছিলেন,[2] "এখনকার কালের পণ্যস্ত্রীদের আদর্শে তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। তারা যে দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্যই তা নয়, তারা চিত্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্য। কাপুরুষের কাছেই স্ত্রীলোকেরা লালসার সামগ্রী, বীরের কাছে নয়। কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই স্ত্রীলোককে হীন করে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবীই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষেই নারীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা করে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ-পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হেয় এমনতর বিচারের আভাসমাত্র এই নাটকে কোথাও নেই। শুধু তাই নয়, বসন্তসেনার যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে।"

রমণীর দায়িত্ব দু-জাতের—জৈবিক, পারিবারিক ও মাতৃত্বের এবং মানসিক, হ্লাদিনী, অনুপ্রেরণার। বিধাতার বিচিত্র খেয়ালে ঐ দুজাতের দায়িত্ব নেবার অধিকার সকল স্ত্রীলোকের থাকে না। কেন থাকে না, এই প্রশ্নটাই অবৈধ। বিশ্বশিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস আমাদের সেকথাই বলছে।

ম্যাডোনা আর ভেনাস্, লক্ষ্মী আর উর্বশী কচিত মিলিত হন। মেরী-পীয়ের অথবা আইরিন-জোলিও কুরী ইতিহাসে দুর্লভব্যতিক্রম—কোটিকে যুগল। জান্তিপীর তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত সক্রেটিশ আবার ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা—কোটিকে গুটিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে

কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং তাঁদের সন্তানের জননীকুল এই সত্যটাকে মনে না নিলেও মেনে নিয়েছেন। অনিবার্য নিয়তির নির্দেশ হিসাবে—জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মতো। যদি 'ঝরনাতলার উছল পাত্রটি' হয় পরস্ত্রী, তখন 'ঘরের কোণে ভরা পাত্র' নীরব থাকলেও সামাজিক কেলেঙ্কারী চরম হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি বা দ্বিতীয়া রমণী যদি হন গ্রীসের হেটেরা, প্রাচীন ভারতের জনপদকল্যাণী, জাপানের গেইসা, উনবিংশশতকের পারী নগরীর demi-mondaine অথবা আধুনিককালের অলোকপ্রাপ্তা উইমেন্স লিব-এর ধ্বজাধারিণী 'মড', তাহলে প্রতিবেশিনীর খরজিহ্বা খরতর হবার দিকে ঝোঁকে না।

শিল্পী বা প্রতিভাবানের কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার প্রতিভা বিকাশের রুদ্ধদ্বার খুলে দেবার উপযুক্ত কুঞ্চিকাটির সন্ধান পাওয়া মাত্র সে দুর্নিবার বেগে সেদিকে ছুটে যায়। ইদানীং ডিভোর্সের সুযোগ এসেছে, এতদিন হতভাগিনী স্ত্রী শান্তমনে এ দুর্ঘটনাকে মেনে নেবার চেষ্টা করত।

সেনেটর পেরিক্লস্ থেকে পল গগ্যাঁ—এবং তাঁর আগে ও পরে একই ইতিহাস। এথেন্সের মহাপ্রতিভাধর রাজনীতিবিদ্ পেরিক্লস্—যিনি বিশ্বস্থাপত্যকে উপহার দিয়েছেন পার্থেনন—তিনি সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন তদানীন্তন গ্রীসের শ্রেষ্ঠা 'হেটেরা' অ্যাস্পেশিয়ার কুঞ্জে। গগ্যাঁ তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রীকে বর্জন করে চলে গেলেন সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে—আশ্রয় নিলেন এক অনার্যার বাহুবন্ধে। নানান দেশের, নানান কালের একই ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

হয়তো ছেলেমানুষি হচ্ছে, তবু যে মালোপমাটা মগজে এল সেটাও পেশ করি :

মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা সম্যজটাকে সাজাতে চেয়েছিলেন আধুনিককালের ফুটবল খেলার আইনে। স্ত্রী হচ্ছেন গোলকীপার। একই গোলের দুই স্তম্ভের মাঝখানে তার অবস্থান— বড়জোর লক্ষ্মণের খড়ির গণ্ডী দেওয়া পেনাল্টি সীমানার মধ্যে তাঁর সীমিত নড়াচাড়া। এক প্রান্তে সদর, অপর প্রান্তে খিড়কি। কিন্তু ঐ খড়ির গণ্ডী দেওয়া সীমিত ভূখণ্ডে তিনি স্বরাজ্যের নিরঙ্কুশ সম্রাজ্ঞী। আকিঞ্চনের যে অকিঞ্চনটি নিয়ে এত মারামারি, হানাহানি—যাকে সবাই মিলে কখনও তুলছে মাথায়, কখনও করছে পদাঘাত—একমাত্র তিনিই সেটাকে দুই হাতে কোলে তুলে নিতে পারেন। এ অধিকার আর কারও নেই। তবু ঐ যে অগণিত দর্শকদল ওরা কিন্তু বাস্তবে সে দৃশ্যটা দেখবার জন্য সমবেত হয়নি। গোলকীপার সদ্যোজাত শিশুর মতো ঐ অকিঞ্চনটিকে কোলে তুলে নিলে তারা প্রশংসা করছে বটে—কিন্তু ওরা বাস্তবে এসেছে ভেনাসের সন্ধানে, ম্যাডোনার নয়। ভেনাসের দল আছে সামনের সারির ফরোয়ার্ড লাইনে। খিড়কি-সদর থেকে অনেক অনেক দূরে। ওরা ঐ অকিঞ্চনকে দুই হাতে বুকে তুলে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত—তা হোক। দর্শকদলের নজর ওদের দিকেই। ওরা নানান ছলচাতুরী

জানে। ডাইনে বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে, ঢুকে পড়ে পরের ঘরে। মোহিনীমায়ায় জাল বিস্তার করে শেষমেশ ঐ জড়বস্তুটাকে ঠেলে দেয় পরের ঘরে।

আর সমস্ত গ্যালারি তখন সমস্বরে ভেঙে পড়ে উল্লাসে—গো—ল!

Goal! সেটাই লক্ষ্য। দুর্ভাগ্য, সেটা ঘরের কোণে ভরা পাত্রে থাকে না। থাকে ঝরনা-তলার উছল পাত্রে। পরের ঘরে।

এটাই নাকি খেলার আইন।

* * * * *

একটা কৈফিয়ৎ বাকি আছে। ইতিপূর্বে বলেছি, আমার ধারণা—তৃতীয় খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের সেই যোগীমারা গুহার অজ্ঞাত দেবদিন্ন চিত্রশিল্পী ছিল না, নৃত্যশিল্পী ছিল না, ছিল ভাস্কর। একথা কেন বলছি?

তার হেতু ললিতকলার যাবতীয় বিভাগের ভিতর ভাস্কর্যই হচ্ছে সবচেয়ে পৌরুষব্যঞ্জক। সেই শিল্পটি ত্রিমাত্রিক বাস্তবের বড় কাছাকছি, এবং সেই শিল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্য-সরস্বতীকে লাভ করতে হয় পেশী সঞ্চালনে—কণ্ঠের কসরৎ, অঙ্গুলিহেলনে বা ভ্রূভঙ্গিতে নয়। সে দেবীর পূজার গঙ্গোদক শ্রমজল! য়ুরোপের উচ্চ-রেনেসাঁর দুই দিকপালকে তুলনামূলক বিচারে তৌল করে দেখতে পারেন : লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি এবং মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোত্তি। দুজনেই চিরকুমার। লেঅনার্দো, যাঁর শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি তুলির টানে, তিনি কোনও 'হ্যাদিনী' শক্তির সন্ধান করেছেন বলে জানি না। না, মোনালিসা নয়, ঐ রমণীর প্রতিকৃতি বিশ্বললিতকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও নিঃসংশয়ে বলা যায়—লিজা কোন অর্থেই ছিলেন না লেঅনার্দোর প্রেরণার উৎস। উভয়ের মধ্যে বিশেষ অর্থে 'প্রেম'ও সঞ্চারিত হয়নি। অপরপক্ষে চিরকুমার মিকেলাঞ্জেলো রমণীর দুই রূপই দেখেছেন—উর্বশী ও লক্ষ্মী। দেহজ ও দেহাতীত প্রেম। আর্ভিন স্টোনের রচিত "The Agony and Ecstasy" গ্রন্থে একাধিক স্থলে যে বর্ণনা আছে তার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। খনি থেকে তুলে আনা শ্বেত মর্মরটিকে মিকেলাঞ্জেলো প্রথমে ধুয়ে-মুছে নিচ্ছেন, স্নান করাচ্ছেন, কখনও বা আবেগে তাকে চুম্বন করছেন, জড়িয়ে ধরছেন। তারপর দুই হাঁটুর মধ্যে সেই দুগ্ধশুভ্র মর্মরকে চেপে ধরে আঘাতের পর আঘাত করছেন।

যে হ্যাদিনী-শক্তি তাঁর প্রতিভাদীপে প্রথম আলোকস্পর্শ করিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন কন্টাসিনা, 'Little Countess' বা বাঙলায় 'ছোট্ট রাজকুমারী'। ফ্লোরেন্সের নগরাধিপতি লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট-এর কনিষ্ঠা আত্মজা। পনের বছর বয়সে মিকেলাঞ্জেলো তাঁকে প্রথম যখন দেখেন তখন কন্টাসিনার বয়স মাত্র তের। ঐ লরেঞ্জোর শিল্পোদ্যানে, যেখানে মিকেলাঞ্জেলো শিক্ষার্থী হিসাবে ইতিপূর্বে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম—উভয়তই—'কাফ্ লাভ'। ক্রমে সেই ছেলেমানুষি এক স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত

হয়েছিল। অথচ দুজনের কেউই অপরের কাছে সে-কথা স্বীকার করতে পারেননি! স্টোনের[3] বর্ণনার আক্ষরিক অনুবাদ শোনাই—মিকেলাঞ্জেলোর বয়স তখন সতেরো—

"রাজকন্যা এক পা এগিয়ে এল। ওদের ঠোঁটের মধ্যে তখন মাত্র দু আঙুলের ব্যবধান। রাজকন্যার পরিচারিকা বুদ্ধিমতী—সে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়। কন্টাসিনা বলে, 'প্যেরো (ওর দাদা) বলেছেন রিডোল্‌ফি পরিবারের (যেখানে তার বিবাহ স্থির হয়েছে) সকলে তোমার-আমার মেলামেশাটা ভাল চোখে দেখবে না। অন্তত বিয়েটা না চুকে যাওয়া পর্যন্ত।'

মিকেল জবাব দেয় না। তার অধরোষ্ঠ অগ্রসর হয় না। সে নিজেই যেন মর্মর মূর্তি। অথচ সেই মুহূর্তে মিকেলাঞ্জেলো মনে মনে ওকে আলিঙ্গন করে ধরেছে, ওর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হয়েছে—কল্পনায় সে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে ওর চুম্বনতৃষিত ওষ্ঠাধর।"

স্টোনের সাতশ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে মিকেল-কন্টাসিনার দৈহিক মিলনের এইটিই ঘনিষ্ঠতম বর্ণনা। দুজনের বারে বারে দেখা হয়েছে, শেষ দেখা কন্টাসিনার মৃত্যুশয্যায়—মেয়েটি তখন তিন সন্তানের জননী!

মিকেলাঞ্জেলো সারাটা জীবনে কোনদিন সাহস সঞ্চয় করে বলতে পারেনি সেই বিশেষ কথাটা। কন্টাসিনা পেরেছিল। সহজ ভাষায় নয়, তির্যক পন্থায়।

ঘটনাটা ঘটে যখন মিকেলাঞ্জেলো ফিরে এল 'বোলোনা' থেকে। ততদিনে কন্টাসিনা তিন সন্তানের মা হয়েছে।[4]

—বোলোনা কেমন লাগল?

—দান্তে-বর্ণিত নরক!

—সবটাই?

প্রশ্নটা সে সরলভাবেই পেশ করল। তবু তার চোখের কোণায় যেন আর কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। মিকেল হাত দিয়ে নিজের কপালের চুলটা সরাতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—মেয়েটির নামটা কী?

—ক্লারিসা।

—তাকে ছেড়ে এলে কেন?

—আমি ছাড়িনি। সেই আমাকে ছেড়ে গেল।

—ও! যা হোক, এতদিনে তাহলে সে-ই কথাটার মানে অন্তত কিছুটা তুমি বুঝতে পেরেছ। যাকে ওরা বলে: 'ভালবাসা'।

—'কিছুটা' কেন? পুরোমাত্রাতেই।

হঠাৎ থমকে গেল কন্টাসিনা। কি জানি কেন এ আনন্দসংবাদে চোখ দুটি বাষ্পাকুল

হয়ে ওঠে, বলে, —আজ তোমাকে হিংসে হচ্ছে—

মিকেল প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে গেল; কিন্তু তার আগেই রাজকন্যা দ্রুতচ্ছন্দে মিলিয়ে গেল প্রাসাদের অন্দরমহলে।"

স্টোনের দীর্ঘ দুটি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হলাম সেই কথাটারই উদাহরণ হিসাবে বোঝাতে যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দিলীপকুমারকে। কিন্তু দেহাতীত প্রেমের মহিমা বোধকরি ভাস্করের পক্ষে অতটা জোর দিয়ে প্রযোজ্য হতে পারে না। চণ্ডীদাস বলতে পারেন—'কামগন্ধ নাহি তায়।' পো বলতে পারেন :

"Thou wast all that to me, Love
For which my soul did pine–
A green isle in the sea of Love–
A fountain and a shrine,
All wreathed with fairy fruits and flowers
And all the flowers were mine."

"আমার নিখিলে তুমি লীন ছিলে, প্রিয়া
আত্মা আমার তোমারেই শুধু চায়,
প্রাণময় দ্বীপ সাগরের নীলে, প্রিয়া,
তুলসীমঞ্চ আমারই এ আঙিনায়।
যে-ফুলে ও ফলে সেজেছ পরীর বেশে
সে-ফুল যে ফোটে অধমেরই বাগিচায়।"

কিন্তু ছেনি-হাতুড়ি-সম্বল মিকেলের শিল্পস্ফূরণের জন্য কস্টাসিনার পরেও প্রয়োজন হয় ক্লারিসার। আর্ভিন স্টোনের একটি বর্ণনা শোনাই[5]—

মিকেলাঞ্জেলো কিভাবে পাথর খোদাই করছেন..."Now he dug into the mass, entered in the Biblical sense. In this act of creation there was needed the thrust, the penetration, the beating and pulsating upward to a mighty climax, the total possession. It was not merely an act of love, it was the act of love : the mating of his own inner patterns to the inherent forms of the marble, an insemination in which he planted the seed, created the living work of art." (তারপর সে তোরণদ্বার অতিক্রম করল, সৃষ্টিতত্ত্বের মৌল নির্দেশে প্রবিষ্ট হল। সৃষ্টির জন্য এই চাপ অনিবার্য,—প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন, বারে বারে, যতক্ষণ না মিলনের তুরীয় অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ মিলন নয়, মৈথুন—মর্মরের গর্ভে নিজের প্রতিভা-বীজটি বপন করা, যা সৃষ্টির মহিমায় জীবন পেয়ে হয়ে উঠবে—শিল্পসৃষ্টি।) ভাস্কর্যের ইতিহাসে আদিম-কাল থেকে এইভাবেই ঘটেছে শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা।

খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের গ্রীসে প্র্যাক্সিটেলেস্ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। হারমিস্, ক্নিডিয়ান ভেনাস ইত্যাদি শিল্প এবং সম্ভবত 'ভেনাস ডি মিলো' তাঁরই সৃষ্টি। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন পাইরীন- এর। তদানীন্তন এথেন্সের শ্রেষ্ঠ হেটেরা—জনপদকল্যাণী। ঐ অসামান্যা সুন্দরীকে নিরাবরণ মডেল করে শিল্পী একাধিক ভেনাস-মূর্তি গড়েছেন। তার একটির পদতলে—যেভাবে খোদাই করা আছে যোগীমারা-গুহার স্বীকারোক্তি, ঠিক সেভাবেই শিল্পী স্বয়ং খোদাই করে গেছেন এই পংক্তিটি : "Praxiteles hath portrayed to perfection the passion (Eros), drawing his model from the depths of his own heart and dedicates Me to Phryne, as prize of Me." (প্রাক্সিটেলেস তাঁর নিজ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কামনার (দেহজ) অনিন্দিত ব্যঞ্জনাটি এখানে মূর্ত করছেন, আর তাই আমাকে উৎসর্গ করে গেছেন পাইরীনের নামে—সেই তো আমার মূল্য।)

দু'হাজার বছর পরে সাম্প্রতিক কালের (১৮৪০-১৯১৭) শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোঁদ্যার কথা বলি। ওঁর চেয়ে আটত্রিশ বছরের ছোট বিশ্ববন্দিত মার্কিন নৃত্যশিল্পী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন রোঁদ্যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের একটি ঘটনা। একটি গ্রীক-নৃত্য দর্শনান্তে স্বল্পবাস-পরিহিতা ইসাডোরা ডানকান (১৮৭৮-১৯২৭) রোদ্যাঁকে ঐ ক্লাসিকাল নৃত্যের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন "হঠাৎ আমার মনে হল রোদ্যাঁ আমার কথা শুনছেন না। তাঁর অধরের নিম্নাংশ ঝুলে পড়েছে—তাঁর চোখে আগুনের হল্কা। তিনি যেন অন্যজগতের মানুষ। আমার কাছে তিনি এগিয়ে এলেন। নিঃশব্দে আমার আস্বচ্ছ বেশবাসের উপর দিয়েই সর্বাঙ্গে হাত বুলাতে থাকেন—কাঁধে, স্তনে, হাতে, নিতম্বে, জানুদ্বয়ে এবং পায়ে। হঠাৎ আমাকে দুই হাতে পিষ্ট করতে চাইলেন—যেন আমি একটা কাদার তাল। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে তখন উত্তাপ নির্গত হচ্ছে। আমার ইচ্ছা হল—সেই উত্তাপে মোমের মত গলে যেতে। কিন্তু আজন্মের সংস্কার আমাকে ইচ্ছাপূরণে বাধা দিল। আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম। দ্রুত হস্তে জামা-কাপড়গুলো টেনে নিয়ে বললাম, 'আপনি চলে যান'।"[৬]

আমাকে মার্জনা করবেন। আমার বিশ্বাস, ঐ দেবদাসী নামক কুপ্রথাটি যদি ভারতবর্ষে চালু না থাকত তাহলে এই ভারতভূখণ্ডের অযুত-নিযুত মন্দিরে ঐ অনিন্দ্যকান্তি রমণীমূর্তিগুলিকেও আমরা পেতাম না। ঐ নাগরদোলায় দোলায়িত ঘৃণ্য নরকের কীটগুলিই ছিল যুগে যুগে ভারতীয় ভাস্করদলের 'স্টার অব বেথ্লহেম!'

বাইবেল বলেছেন, পুব দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীর দল জেরুজালেম তীর্থে পথ চিনে-চিনে আসতে পেরেছিলেন ঐ তারার আলোয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় ভাস্করদল নিজ নিজ বেথ্লহেম-তারকার আলোয় পথ চিনে চিনে ললিতকলালক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করেছেন।

একটা উদাহরণ দিই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। ঘটনাটা আমি অবশ্য ইতিপূর্বেও বলেছি।

প্রায় দশ বারো বছর আগেকার কথা। 'কলিঙ্গের দেব-দেউল' নিয়ে কিছু গবেষণা-মূলক কাজ করব বলে উড়িষ্যা পরিক্রমা করছি। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মন্দির কোণার্কে আছি দিন সাতেক। প্রতিদিনই মন্দিরে যাই, স্কেচ করি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে দেখেছি পীড়দেউল—অর্থাৎ জগমোহনে ছিল দুই পোতাল। কোণার্কে সেটা তিন পোতাল বা তিন ধাপে গড়া। নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোতালে পীড় বা 'ফিন'-এর সংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় এবং পাঁচ। এই তিন পোতালের পরিকল্পনা কলিঙ্গে আর কোনও মন্দিরে আমার নজরে পড়েনি।

প্রথম পোতালের চাতালে চারিদিকে চারটি করে সর্বসমেত ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি। এ-ছাড়া রাহা-পাগ অংশের ঝুঁকে-থাকা অংশে চার দুকুনে আটটি নৃত্যরত মহাকাল বা ভৈরব মূর্তি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলটি নৃত্য-বাদ্যরতা কন্যামূর্তি আছে। সেখানে ভৈরব মূর্তি নেই। সর্বোচ্চ তৃতীয় পোতাল দর্শকের দৃষ্টিপথে সব চেয়ে দূরে। সেখানে কোন মূর্তি নেই।

কোণার্ক-জগমোহনের এই ষোলটি নায়িকা-মূর্তিভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বেশ মনে হয়, মূর্তিগুলি একই ভাস্করের হাতে গড়া। তাদের শৈলী এবং 'প্রমাণ' বা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুপাতিক হার সমান। প্রথম পোতালের চাতাল পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে, অন্তত সত্তরের দশকেও যাত্রীদের অতখানি পর্যন্ত যাবার অনুমতি ছিল। তার উপরেও ওঠা যেত; কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ। প্রথম পোতালের উপর উঠে আমি স্কেচগুলি আঁকতাম। সেখানে উঠলে মনে হয় মূর্তিগুলি কিছু স্থূলকায়া। প্রমাণ মানুষের চেয়ে উচ্চতায় বেশী। শিল্পশাস্ত্র বলছেন, নারীমূর্তিগুলি হবে সপ্ততাল—কিন্তু সে নির্দেশ এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে চলেননি। তিনি জানতেন, এই বিশেষক্ষেত্রে দর্শক

ও ভাস্কর্য এক সমতলে থাকবে না। দর্শক সচরাচর নিচে থেকেই দেখবে। তাই তার তাল-মান এমনভাবে নির্ণয় করেছেন যাতে নিচে থেকে আদৌ মনে হয় না—ঐ মেয়েদের 'ডায়েট' করা দরকার।

কন্যামূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে দেবদাসীদের। তারা নৃত্যরতা—তাদের হাতে নানান বাদ্যযন্ত্র—ঢোলক, মৃদঙ্গ, বীণা, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদি। অঙ্গে তাদের নানান জাতের আভরণ—কঙ্কন, কেয়ূর, শতনরী, কর্ণাভরণ, মুকুট প্রভৃতি। তাদের চুলবাঁধার কায়দাতেও কত বৈচিত্র্য।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই পীনোদ্ধত যুবতীবৃন্দের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব অথবা বেশভূষাই শুধু নয়, ভাবব্যঞ্জনাতেও প্রতিটি মূর্তি আর সকলের থেকে পৃথক। ধরা যাক প্রথম পোতালের পূর্বমুখী নায়িকাটিকে। ফুঁ দিতে গিয়ে ওর গালটা একটু ফুলেছে। অল্পবয়স, মনে হয় পঞ্চদশী। এখনও যেন কিশোরী। ও-যেন দুনিয়াদারীর অনেক কিছুই বোঝে না— তাই এখানে সুতনুকার হাসিটি অমলিন।

কোনার্ক জগমোহনের প্রথম পোতালের পূর্বমুখী : বেণুবাদিনী।

কোনার্ক জগমোহনের প্রথম পোতালের দক্ষিণপ্রান্ত বাসিনী : করতালবাদিনী

এবার ঠিক উপরের ধাপে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পোতালের পূর্বমুখী মেয়েটিকে দেখুন।

সে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তে। এখানে সুতনুকা পঞ্চদশী নয়—সে পূর্ণযৌবনা। ভাদ্রের ভরা গাঙের মতো তার যৌবন 'টলমল-টলমল'। কিন্তু কি জানি কেন মনে হল ও বিষাদখিন্ন—সহস্রাক্ষের আদেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে কিছু একটা ভাবছে। কী ভাবছে? যে দেবদিন্নর সমুখে ওকে এই বঙ্কিমঠামে দাঁড়াতে হয়েছে তার থেকে দূরত্বের কথাটাই? কাছে গিয়ে আর একবার স্কেচ করলুম অপর দিক থেকে—তবু ওর মনের নাগাল পেলুম না।

এবার দেখুন প্রথম পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তবাসিনী পূর্বমুখী করতালবাদিনীকে। মনে হয়— এও কিশোরী নয়, মধ্য-যৌবনা ; যদিও হয়তো পূর্বোক্ত দেবদাসীর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। দেবদাসী জীবনের যেন একপিঠই সে দেখেছে—চন্দ্রাননী জানে না—চন্দ্রের বিপরীত দিকে শাশ্বতকালের নীরন্ধ্র অন্ধকার! কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যৌবনোত্তর বারনারীদের যে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন সে আইন আর মানে না কোনও রাজা! কিন্তু সেই অনাগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেনি ওর ভঙ্গিমায়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধতার দার্ঢ্য। ওর হাসিতে মিশে আছে উপেক্ষা। শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে। করতাল হাতে সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে দেবদিন্নর সমুখে।

কোনার্কজগমোহনের দ্বিতীয় পোতালের পূর্বমুখী : ঢোলকবাদিনী।

এবার শেষ উদাহরণ। যার স্কেচ এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দিয়েছি। বস্তুত যার কথা বলব বলে পাশাপাশি কয়েকটি নায়িকা মূর্তির চালচিত্র রচনা করছি। এটি আছে দ্বিতীয় পোতালে। উত্তর প্রান্তে! এ মূর্তিটি পশ্চিমমুখী। ওর দৃষ্টি অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে। অপূর্ব এই মূর্তিটি। ওর অধরপ্রান্তে লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস—কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃউৎসারিত নয়—যেন বাসিফুলের মালার হাসি। কেন-যেন মনে হয়—মেয়েটি খিন্ন, ক্লান্ত ; আর সে শ্রান্তি দৈহিক নয়, মানসিক, আত্মিক! দেবদাসী-জীবনের আবরণ ও আভরণে বুঝি ওর মন ভরেনি, যেন কোন সুদূর পল্লীপ্রান্তের এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতিতে ওর হাসিটি বিধুর। কিম্বা কি-জানি পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায়গ্রহণে ও এমন বিষাদখিন্ন। কে জানে?

এই মূর্তিটির স্কেচ করার সময় একটা অদ্ভুত ইতিকথা সংগ্রহ করা গেছিল—যেটা

আপনাদের শোনাব এবার। উপকথাটি আমি সংগ্রহ করেছিলুম একজন বৃদ্ধ গাইড-এর কাছ থেকে। আমাকে ঐ মেয়েটির স্কেচ করতে দেখে সে ঘনিয়ে এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। বস্তুত ক'দিন আগেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। প্রভঞ্জনবেগে যে সব টুরিস্ট আসেন আর শালপাতা, চিনে বাদামের খোলা ছড়িয়ে রেখে ঝটিকাগতি প্রত্যাবর্তন করেন, আমি যে তাদের দলে নই, হয়তো এটুকু সমঝে নিয়েই সে আমাকে ভালোবেসেছিল। প্রখর মধ্যাহ্নে যখন যাত্রীদলের ভিড় থাকত না তখন সে ঘনিয়ে এসে বসত আমার কাছে, ছায়ায়। আমার ফ্লাস্ক শূন্যগর্ভ হলে যেচে জল এনে দিত নিচে থেকে। কখনও বা গরম চা।

তার মুখেই শুনেছি, এই উপকথাটি। সে শুনেছিল অপর একজন স্বর্গত পেশাদারী গাইডের মুখে, অন্তত ত্রিশ বছর আগে। এই মুখে মুখে চলে-আসা কাহিনীর মূল কোথায় আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কাহিনীর চরিত্রগুলির নামও সে বলেছিল, সে সব কথা ভুলে গেছি ; কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না কিছু। নামগুলি তো আমরা জানিই।

বৃদ্ধ গাইডের মতে কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি একই হাতে গড়া বটে ; কিন্তু উপর-পোতালে ষোলটি মূর্তি দ্বিতীয় আর এক শিল্পীর হাতের কাজ। আমি মানতে চাইনি। এ নিয়েই তর্ক। এবং সেই সূত্রেই উপকথাটির অবতারণা:

কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি যিনি গড়েছিলেন, ধরা যাক তাঁর নাম বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে, লবণাক্ত সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়াকে অস্বীকার করে তাদের লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। তাঁর সমতুল্য প্রতিভাবান ভাস্কর ছিল না সমকালের ভারত-ভূখণ্ডে। কিন্তু ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত। বিশ্বকীর্তি শিল্পী হওয়া ছাড়া আর কোনও অপরাধ তিনি করেননি—স্বাধিকার-প্রমত্ততার আর কোনও নজির নাই ; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে আনা হয়েছিল অর্কক্ষেত্রে। জগমোহনের উচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী পুষ্করমেঘের উদ্দেশে তিনি কুর্চি ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন কি না জানা নেই। কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা যৌবনবতী ভাস্করজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তাঁর পুনর্মিলন হয়নি। দ্বাদশবর্ষকাল এই অর্কক্ষেত্রেই প্রাণপাত পরিশ্রম করে অন্তিমে এখানেই প্রাণপাত করেছিলেন তিনি।

ভাস্কর বিশ্বকর্মা মুক্তি পেলেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার তরফে নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য-পুরোহিত সহস্রাক্ষ প্রমাদ গণলেন—তলা পোতালের মূর্তিগুলির সমতুল্য উপর-পোতালের মূর্তিগুলি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে

যাননি। দু-একজন বিশিষ্ট ভাস্করকে দিয়ে সে কাজ করানোর চেষ্টা হল—কিন্তু তাদের কাজ একটুও মনোমত হল না সহস্রাক্ষের । মহামাত্য চর্তুদিকে সন্ধান করতে থাকেন, বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত শিল্পী কি গোটা কলিঙ্গ রাজ্যে নেই? দূত ছুটল রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেল। আছে। বিশ্বকর্মার হাতের কাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো কারিগরও আছে স্বর্ণপ্রসূ কলিঙ্গ রাজ্যে। দূত স্বচক্ষে দেখে এসেছে তার হাতে-গড়া পাথরের মূর্তি। সে মূর্তি নাকি অপূর্ব। শিল্পতীর্থ কোণার্কেও নাকি অমন সুন্দর, অমন প্রাণবন্ত মূর্তি নাই।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল সহস্রাক্ষের। বললেন, কী বক্‌ছ উন্মাদের মতো?

হাত দুটি জোড় করে সংবাদবহ নিবেদন করে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি প্রভু, না হলে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না।

—তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—সে অস্বীকার করল। বলল, তোমাদের রাজাও মন্দির গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাত্য। কে এই দুঃসাহসী ভাস্কর? কোন্ সাহসে সে প্রত্যাখ্যান করে রাজাদেশ? আত্মসংম্বরণ করে শুধু বললেন, মন্দির গড়ছে? নিজ ব্যয়ে? কোন্ দেবতার মন্দির?

—জানি না প্রভু। মন্দির এখনও শুরু হয়নি। সে গড়ছে একটি দেবমূর্তি। আমি সেই অসমাপ্ত মূর্তিটি দেখেছি প্রভু, কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারিনি। পুরুষমূর্তি। দেবতার। শুনলাম, সে দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। অশ্বমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে। দেবমূর্তিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—অশ্বারোহী দেবমূর্তি? হরিদশ্ব?

দূত মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না প্রভু। হরিদশ্ব তো অশ্বারোহী সূর্যমূর্তি। ইনি অশ্বারোহী নন, আছেন ভূতলে, অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরে তার গতি রুদ্ধ করেছেন।

দুরন্ত কৌতূহল হল সহস্রাক্ষের। শুধু কৌতূহল নয়, ক্রোধ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট শিল্পশাস্ত্রসম্মত ভাবমূর্তি আছে। অশ্বারোহী মূর্তির পরিকল্পনা আছে সামান্যই। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'হরিদশ্ব-সূর্য' মূর্তি। বিশ্বকর্মা সে মূর্তি ইতিপূর্বে গড়েছে কালো কষ্টিপাথরে। মূল বিমানের উত্তর-পার্শ্বদেবতা হিসাবে সে মূর্তিটি অধিষ্ঠিতও হয়েছে। তাহলে এই অর্বাচীন ভাস্কর কোন্ দেবতার মূর্তি গড়ছে? পদাতিক-অশ্বারোহীর কোনও পরিকল্পনা তো শিল্পশাস্ত্রে নাই! শুধু এজন্য—শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধেই তো লোকটার শিরচ্ছেদ করা চলে! কিন্তু না! মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে দেখতে হবে লোকটা বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ

শেষ করতে পারে কি না।

সপার্ষদ তখনই রওনা হয়ে পড়েন অশ্বপৃষ্ঠে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে।

স্বচ্ছতোয়া করুণা নদীর একান্তে একটি ঝিমন্ত পল্লীগ্রাম একদিন মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরধ্বনিতে। রাজপ্রতিনিধি মহামাত্য সহস্রাক্ষ নাকি স্বয়ং এসেছেন গ্রামে। দূতের সঙ্কেতে অশ্বারোহীর দল এসে থামে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটীরের সম্মুখে। বাহির হয়ে আসে নগ্নগাত্রে এক তরুণ ভাস্কর। তার হাতে ছেনি-হাতুড়ি।

শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়তচক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প আবার এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে তাকায় আগন্তুকের দিকে।

সহস্রাক্ষ আত্মপরিচয় দেওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি তালপাতায় বোনা একটা চাটাই বিছিয়ে দেয় মেটে দাওয়ায়। মহামাত্য অবশ্য তাঁর মহামূল্য বসনে পল্লীপ্রান্তের ধূলার প্রলেপ লাগাতে অনিচ্ছুক ;তাই গৃহদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রশ্ন করেন, তোমার নাম?

—দেবদিন্ন।

—তুমি নাকি পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমান্ মহারাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মন্দির গড়ছ?

দেবদিন্ন ম্লান হেসে বলে, আজ্ঞে না। ভুল শুনেছেন। আমি উন্মাদ নই। তাছাড়া কারও সঙ্গেই পাল্লা দেওয়ার বাসনা আমার নাই। আমি নিজ অভিরুচি অনুসারে একটি দেবমূর্তি গড়ছি মাত্র। মন্দির নির্মাণের আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই।

—বটে! কোন্ দেবতার মূর্তি?

—ভাস্করের।

—অর্থাৎ সূর্যের?

—আজ্ঞে না। তিনি স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্তের ভাস্কর। সূর্য অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্!

অর্থ গ্রহণ হয় না সহস্রাক্ষের। তবু অখ্যাত পল্লীগ্রামের এই অর্বাচীনের ঔদ্ধত্যে তাঁর দক্ষিণহস্ত অভ্যাসবশে চলে গিয়েছিল তরবারির মুঠের দিকে। ব্রাহ্মণ হলেও রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র। শেষে কোনক্রমে ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, আমরা তোমার সেই মূর্তিটি একবার দেখতে পারি?

—এ তো আমার সৌভাগ্য। আসুন ভিতরে—

গৃহ-প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটির দিকে দৃকপাত করেই চমকিত হন সহস্রাক্ষ। বলেন, এ কি! দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের প্রয়াত ভাস্কর ঃ বিশ্বকর্মা মহাপাত্র?

দেবদিন্ন সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই মূর্তি। আমার কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম, তিনিই আমার পরমংতপঃ!

—তুমি,.....তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র?

—না হলে ও-কথা বলব কেন?

দেবদিন্নের কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজী নন মহামাত্য। বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ এই দেবদিন্ন ভিন্ন আর কেউ শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তরুণ শিল্পীও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললে, মায়ের সমস্ত অভিশপ্ত জীবনটা চোখের উপর দেখেছি। এ আদেশ আপনি করবেন না প্রভু। জননী আজ দৃষ্টিশক্তিহীনা—আমিই তাঁর অন্ধের যষ্টি। আর তা ছাড়া.....

সঙ্কোচে সে থেমে যায়।

কিন্তু রাজার প্রয়োজনের কাছে অন্ধ বৃদ্ধার চোখের জলের কী মূল্য?

অবশেষে দেবদিন্নের জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন পুরোহিতের চরণদুটি। দেবদিন্নের অসমাপ্ত বাক্য শেষ করে বললেন, পুত্রের বিবাহ স্থির করেছি। আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে আমার গৃহে আসছেন পুত্রবধূ। এমন সময়ে এ কী সর্বনাশের কথা বলছেন, প্রভু?

প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের হৃদয় কিন্তু পাষাণ দিয়ে গড়া।

বধূও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেবদিন্নের শিশুকাল থেকেই জানাশোনা। খেলাঘরের বর-বউ হত ওরা। তারপর লক্ষ্মী বড় হয়েছে, এখন সে সঙ্কোচে তার বাল্যবন্ধুর সামনে বড় একটা আসে না। ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা আছে। আহা, দুটিতে ভারি সুন্দর মানায়। গাঁয়ের সবাই কাতর অনুনয় বিনয় করতে থাকে! শেষে লক্ষ্মীর বাবা এসে হাত দুটি জোড় করে বলেন, আপনি পুরোহিত, আপনিই বলুন—এক্ষেত্রে কী করণীয়! আমার কন্যার আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন তো তার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আপনি ওকে স্বচক্ষে দেখুন, আপনি কিছুতেই এমন লক্ষ্মী প্রতিমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারবেন না।

ভিড়ের ভিতর থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্ধোন্মাদ টেনে নিয়ে আসেন ব্রীড়াবনতা একটি নতমুখী বালিকাকে। সলজ্জে এগিয়ে এসে সে সহস্রাক্ষের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেলেন প্রধান পুরোহিত! এমন পরমাসুন্দরী একটি নারীরত্ন কেমন করে লুকিয়ে ছিল এই ছায়াঘন পল্লীপ্রান্তে! ধীরে ধীরে বলেন, তোমরা ঠিকই বলেছ! এমন সুতনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি, মহারাজের আশীর্বাদে এই পঞ্চদশীর সর্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি। কিন্তু তার পূর্বে দেবদিন্নকে এখনই যেতে হবে আমার সঙ্গে। মহারাজের দরবারে। সব কথা বলতে হবে তাঁকে।

দেবদিন্ন বলে, রত্নালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই! এ মূর্তি অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না। আমি কারও বেতনভুক ভৃত্য নই! রাজশক্তির এমন ক্ষমতা নেই....

তার মুখে চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার বিধবা, অন্ধ বৃদ্ধা। কথাটা শেষ হয় না ; না

হোক, তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না কারও।

অন্তত সহস্রাক্ষের।

অথচ আশ্চর্য, সহস্রাক্ষের কোনও ভাববৈকল্য দেখা গেল না। তিনি যেন খেয়ালই করেননি ঐ অসমাপ্ত বাক্যের ঔদ্ধত্য। নিতান্ত কৌতূহলী শিল্পশিক্ষার্থীর মতো প্রশ্ন করেন, এ মূর্তির বক্তব্য কি দেবদিন্ন? ও কেন অমন করে অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরেছে?

তরুণ ভাস্কর ম্লান হাসে। বলে, কোনার্ক মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্তির ব্যঞ্জনা? বেশ তাই দিচ্ছি—আপনারা যে মন্দির গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে, নরসিংহদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না, এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম। তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে। আমার এই মূর্তি তাই সেই ভাবীকালকে ডেকে বলবে —তোমরা শোন্। কোনার্ক তীর্থে নভচারী মার্তণ্ডদেবের রথাশ্বের বল্‌গা একদিন চেপে ধরেছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। অরুণচালিত স্বর্গীয় রথাশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহাপ্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত মহাকাশে ধাবমান থাকবে, নিত্য গতিশীল—কিন্তু মর্ত্যে? এই কোণার্ক-ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সেই অশ্ব গতিহীন। চরৈবেতিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের 'ভাস্করের' অশ্ব মর্ত্যের 'ভাস্করের' হাতে নিশ্চল, গতিহীন, পাষাণ।

সহস্রাক্ষ বলেন, এই যদি হয় তোমার বক্তব্য, দেবদিন্ন, তবে এ মূর্তিটিকেও আমি নিয়ে যাব কোণার্ক-ক্ষেত্রে। সে মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে স্থায়ী আসন পাবে বিশ্বকর্মা মহাপাত্রের এই মূর্তিটি। পৃথিবী দেখুক, ভাবীকাল জানুক—স্বর্গীয় ভাস্করের অশ্ব কীভাবে গতিহীন হয়েছে পার্থিব ভাস্করের হাতে।

দেবদিন্ন বললে, তথাস্তু।

মহামাত্য সহস্রাক্ষ তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দেবদিন্নের স্বহস্তে গড়া বিশ্বকর্মার মূর্তিটি আজও আছে কোণার্ক জগমোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে- মূর্তি কী জানি কেমন করে মুণ্ডহীন।

দেবদিন্নও রেখেছিল তার প্রতিশ্রুতি। নিরলস পরিশ্রমে সে কাজ করে গেছে কোনার্কে। কে জানে হয়তো সেও কালে হয়েছিল প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্কতীর্থেই। কোণার্ক জগমোহনের উপর-পোতালে তার হাতের কাজ আজও দেখতে পাবেন ; বুঝতে পারবেন না, সে মূর্তিগুলি তল-পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়। পুত্রের হাতে পরাজয়ই নাকি পিতার কাম্য। স্বর্গ থেকে তাই তৃপ্ত হয়েছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। হয়েছিলেন কি?

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম : আর লক্ষ্মী? তার কী হল? দেবদিন্নের নিরলস পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ কী তাকে তার সোনার অঙ্গ সোনা দিয়ে সত্যিই মুড়ে দেননি?

ম্লান হেসে বৃদ্ধ বলেছিল, মহামাত্য কী তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন, বাবুজী? আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া কন্যার অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন? মহারাজের আদেশে তিনি সত্যিই স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন সুতনুকাকে।

—মানে লক্ষ্মীকে?

—না বাবুজী। লক্ষ্মীকে আর কেউ কোনদিন দেখেনি। মহামাত্যের মতো মহারাজও বলেছিলেন, এমন সুলক্ষণা সুতনুকার অনত্র বিবাহ অসম্ভব। লক্ষ্মীর লৌকিক বিবাহ হয়নি। জানি না, কে তার 'অভিষেক' করেছিলেন—বৃদ্ধ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়া অথবা লালসাজর্জর পুরোহিত সহস্রাক্ষ। কিন্তু সে অস্তিমে হয়েছিল কোণার্ক মন্দিরের রুদ্রগণিকা। অলঙ্কারা। মজা এই, রাজাদেশে দেবদিন্নকেই গড়তে হয়েছিল সেই সুতনুকার মূর্তি। তার ছবিই তো আঁকলেন এতক্ষণ সারা দুপুর ধরে।....

স্বীকার করি, এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। এ শুধু মুখে মুখে চলে আসা উপকথা। তবু মন চায় বিশ্বাস করতে—যেন তাহলেই ঐ নারী মূর্তির এই ভাবব্যঞ্জনার হদিস মেলে।

ওর চোখে কোন্ মাঘী শুক্লা সপ্তমীর কুয়াশা-ঢাকা রহস্য। পিগ্‌ম্যালিয়ানের মতো প্রাণের সবটুকু আকুতি উজাড় করে গড়েছে বলেই দেবদিন্ন এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও আবার গড়তে পেরেছে তার সুতনুকার আলেখ্য—

পাথর তো নয়, এ মূর্তি যে প্রেম দিয়ে গড়া।

সাত

যদিও সাধারণভাবে বলা যায় উত্তর-ভারতের চেয়ে দাক্ষিণাত্যেই দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তবু ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়েই উত্তর ভারতে এই দেবদাসীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা গেছে।

খ্রীস্ট পূর্ব যুগের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাৎসায়নের কামশাস্ত্র যদি তৃতীয় খ্রীস্টাব্দের রচনা হয়, তবে মেনে নিতে হবে কৌটিল্য থেকে বাৎসায়নের যুগে তাদের ভাগ্যের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। বাৎসায়ন ছয়-ছয়টি অধ্যায় ব্যয় করেছেন বারবণিতাদের জন্য। লক্ষণীয় উভয়েই দেবদাসী শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেননি। যেন সে দায় পুরোহিতকুলের।

এরপর আসে দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' এ কামমঞ্জরীর উপাখ্যান। কামমঞ্জরী কিন্তু দেবদাসী নয়, জনপদবধূ। কামমঞ্জরী সখীর সঙ্গে বাজি ধরে যে, ছলাকলায় সে জিতেন্দ্রিয় ঋষি মারিচকে বশ করবে। 'মারিচ'-কে চিনতে পারলেন তো? উত্তরাকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্যতম ঋষি। সখীর মনে হয়েছিল, সেটা অসম্ভব ; বলেছিল —তাঁ যদি পারিস তবে তোর দাসী হয়ে থাকব।' দুর্ভাগ্য বেচারির। দাসীত্ব তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল ; কারণ কামমঞ্জরী তার ছলা-কলা-অভিনয়ে ব্রহ্মচারীকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিল।

"গুপ্ত যুগে পাচ্ছি কালিদাসের বর্ণনা :
'পাদন্যাসৈঃ ক্বনিতবশনাস্তত্র লীলবধূতৈঃ
রত্নস্থায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্বন্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু
নামোল্যন্তে ক্ষয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘাণান্ কটাক্ষান।।'[1]

"সেখানে বেশ্যারা চরণক্ষেপে মেখলা ধ্বনিত করে লীলাসহকারে ক্লান্ত হস্তে রত্নপ্রভামণ্ডিতদণ্ডচামর দোলাবে। তাদের অঙ্গের নখক্ষতে তোমার (মেঘের) সুখস্পর্শ নবজলবিন্দু পতিত হলে তারা তোমার প্রতি ভ্রমরশ্রেণী তুল্য দীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে।"[2]

কালিদাসের এই শ্লোকটিতে অনুমান করতে পারি—কেন কৌটিল্য বা বাৎসায়ন 'দেবাদাসী'দের প্রসঙ্গে নীরব। বোধকরি 'দেবদাসী' ও 'বেশ্যা' শব্দ দুটি সে আমলে সমার্থক বলে ধরা হত। কালিদাস-বর্ণিত মহাকাল মন্দিরে যে মেয়েটি ক্লান্তহস্তে চামরবাদনরত সে সন্দেহাতীতরূপে 'দেবদাসী'—নটী, জনপদবধূ বা বারাঙ্গনা বলতে যা বুঝি ঠিক তা নয়। কিন্তু কালিদাস সেই মেয়েটিকে অভিহিত করেছেন—'বেশ্যা' নামে। ঐ শব্দটির বর্তমানে যে যোগরূঢ় অর্থ—গালিবিশেষ—তা সে আমলে প্রচলিত ছিল না ;নচেৎ কালিদাস এই মনোরম বর্ণনায় শব্দান্তরের আশ্রয় নিতেন।

দামোদর গুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়ের মন্ত্রী। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। তাঁর 'কুট্টিনীমতম্ কাব্যম্' পাঠে জানতে পারি দেবদাসীদের বাঁধা মাহিনা ছিল এবং জীবিকাটি ছিল আবশ্যিকভাবে বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ দেবদাসীর কন্যা না চাইলেও তাকে হতে হবে দেবদাসী। দামোদর ভট্ট পড়ে মনে হয় কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরেও সে আমলে দেবদাসী বাহিনী ছিল।

এর দু-তিনশ বছর পরে উত্তরখণ্ডে রচিত হয়েছিল আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ কল্যাণমল্লের 'অঙ্গরঙ্গ' এবং ক্ষেমেন্দ্রনাথের 'শ্যামামাতৃকা'। এঁরা দুজনেই কাশ্মীরী। ক্ষেমেন্দ্র হচ্ছেন 'কথাসরিৎ-সাগর' রচয়িতা সোমদেবের প্রায় সমসাময়িক। তাঁর রচনায় দেবদাসী প্রথার অর্থাৎ ধর্মের অজুহাতে নারীদেহ ভোগের নিন্দা করা হয়েছে। উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরের নির্মাণ কাল আনুমানিক ৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। মন্দিরে উৎকীর্ণ করা একটি লিপিতে জানা যাচ্ছে, পহুব-মহিষী ধর্মমহাদেবীর আমলে চুয়াল্লিশ জন দেবদাসী ঐ মন্দির থেকে মাসিক বেতন পেতেন। মজা এই, ধর্মমহাদেবী রাজমহিষী ছিলেন না; ছিলেন সিংহাসনের অধিকারিণী—সুলতানা রিজিয়া বা কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো। শুধু তিনি একা নন, ঐ রাজবংশে পর পর চারজন রমণী অতি স্বল্প কালের জন্য হলেও কলিঙ্গের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। এবং তাঁরাও মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করে স্বর্গে যাবার সিঁড়ি বানাতে চেয়েছেন।[3] তাঁরা তো কাক নন যে কাকের মাংস খাবেন না।

বঙ্গদেশেও মন্দিরে মন্দিরে ছিল দেবদাসী। ছিটেফোঁটা পোড়ামাটির ভাস্কর্যে হয়তো তাদের দেখেছেন;কিন্তু তাদের বর্ণনা অক্ষয় হয়ে আছে সে আমলের রচনায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে রামাবতী নগরীর মন্দিরে বারবণিতাদের রূপবর্ণনা করা হয়েছে।

তারা ছিল নৃত্যগীতপটিয়সী, সুন্দরী ও সুতনুকা।

কথামৃতের একটি শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছেন আরতি গঙ্গোপাধ্যায় [4] :

"বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভূজিয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রী
র্মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং না পুরতি মনো বঙ্গ বারাঙ্গনানাম্।।"

"দেহে সূক্ষ্ম বসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ-অঙ্গদ , গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপর শিখণ্ড বা চূড়ার আকারে ঘননিবদ্ধ তাতে ফুলের মালা জড়ানো। কর্ণে নবশশিকলার মতো নির্মল তালপত্রের আভরণ—বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করে?"

উত্তর ও মধ্যভারতের মতো পশ্চিম-ভারতেও দেবদাসী-প্রথার সন্ধান বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে চীন-আরব বাণিজ্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে চৈনিক পর্যটক চৌ জু-কুয়া কথাচ্ছলে ভারতবর্ষের দেবদাসীর প্রসঙ্গে এসেছেন। বলেছেন, গুজরাতে সে আমলে প্রায় চার হাজার বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং সে সব মন্দিরে নর্তকীর সংখ্যা কুড়ি হাজার অর্থাৎ প্রতি মন্দিরে গড়ে পাঁচ জন দেবদাসী। চীনা পর্যটক লিখেছেন— এতে অবাক হবার কিছু নেই, কাম্বোজের মন্দিরেও আছে ঐ জাতের নর্তকীদল।[5]

সপ্তদশ শতকের য়ুরোপীয় পর্যটক ট্যাভির্নিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, হায়দ্রাবাদের কাছে গোলকুণ্ডায় অন্তত বিশ হাজার রূপোপজীবিনীর বাস ছিল। প্রতি শুক্রবারে তারা রাজার সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করত। 'শুক্রবারটা' লক্ষ করার মতো—সেটা জুম্মাবার। বস্তুত নিজামের এলাকায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নর্তকীরাই বংশপরম্পরায় এ কার্যে ব্রতী হত। হিন্দু জনপদবধূরা হয়তো পূর্ববর্তী জমানায় ছিল মন্দিরের দেবদাসী— মুসলমান নর্তকীদের মধ্যেও অনেকে তাই। তারা ইতিমধ্যে ধর্মান্তরিতা হয়েছে। এদের লৌকিক বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। হিন্দু হলে বিবাহ হত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে, মুসলমান হলে তরবারির সঙ্গে। বোম্বাই অঞ্চলে এরাই ছিল 'ভাবিন'।

উত্তর ও মধ্যভারতে দেবদাসী প্রথার প্রসার দাক্ষিণাত্যের তুলনায় নিশ্চয় কম ;তার হেতু হিসাবে অনেকের অভিমত—মুসলিম অভিযান। উত্তরখণ্ডে এরপর দেবদাসী সীমিত হলেও নাচনেওয়ালীর অভাব কোনদিনই হয়নি। আকবর থেকে শাহজাহাঁ পর্যন্ত মুঘল জমানায় তারা ছিল আবশ্যিক। আবুল ফজল তো লিখে গেছেন দিল্লীর একটা অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ওদের জন্য। এলাকাটার নাম দেওয়া হয়েছিল— 'শয়তানপুর'।

মুঘল জমানায় এই যে নৃত্যগীতপটিয়সীদের রব্‌রবা তার অবসান ঘটল শেষ গ্রান্ড-

মুঘল-এর আমলে। ঔরঙ্গজীব আইন করে বন্ধ করে দিলেন নৃত্যগীতের আসর। অতঃপর মুঘল-কিল্লার ভিতর এ সব অনাচার আর চলবে না। বাইরে যা হয় হোক। খাফি খান কৌতুকমিশ্রিত বর্ণনায় সেই বিষাদ-সঙ্গীতটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"সেদিন শুক্রবার জুমা মস্‌জিদের পথে হঠাৎ বাদশাহ্ আলমগীরের নজর পড়ল হাজার হাজার গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী রাশি রাশি শবাধার বহন করে চলেছে। বাদশাহ জানতে চাইলেন—"ওরা কে? কাঁধেই বা কে?" উত্তর হল—"দেহরক্ষা করেছে সঙ্গীত, সেই সঙ্গীত যিনি তাবৎ নাচেনওয়ালীর জননী।" উত্তর দিলেন সম্রাট—"সুসংবাদ বটে। ভাল করে কবর দেওয়া চাই।"[6]

কারণ যাই হোক একথা স্বীকার্য যে, উত্তরাপথের চেয়ে দাক্ষিণাত্যে দেবদাসীপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে ;এবং সেখানে অন্ধবিশ্বাস আরও জাঁকিয়ে বসে। মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করলে স্বর্গে যাওয়া সহজ এই মতটা সেখানে দৃঢ়মূল হয়েছিল। যারা দেবদাসী সরবরাহ করত বা ক্রয় করত তাদের বিষয়ে সমাজ ছিল নীরব দর্শক। দাক্ষিণাত্যে দেবদাসীর সমাদর সবচেয়ে বেশি মাদ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে।

দক্ষিণে প্রাচীনতম তাম্রশাসনটি খ্রীস্টীয় ১০০৪ অব্দের। চোল বংশের নৃপতি রাজারাজ জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দিরে সুশিক্ষিতা চারশত "তেলিচ্চেরি পোত্তগাল" বা দেবদাসী দান করেছেন। তাদের জন্য মন্দির সন্নিকটে বাসগৃহও নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রায় বছর পঞ্চাশ পরে খান্দেশের ভাগলি নামক স্থানে প্রাপ্ত আর একটি শিলালিপি পাঠে জানা যাচ্ছে রাজা গোবিন্দদেব মন্দিরে নর্তকীদের ব্যবস্থা করছেন। তাদের ভূসম্পত্তি দান করছেন। এর প্রায় ত্রিশ বছর পরে, ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে চমন-রাজা খোজলা দেব আদেশ জারি করছেন—উৎসবের দিনে নর্তকীদের মনোহর নৃত্যে যদি কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করে তবে তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।[7] এই শেষোক্ত ঐতিহাসিক সনদটির অপর একটি মূল্য আছে। এটি পাঠে মনে হয়—সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী এই দেবদাসী প্রথায় খুশি নয়। সেই শ্রেণীটি নিরন্ন, নিরক্ষর গ্রামবাসী নয়, যাদের ঘর থেকে দেবদাসীদের নানান কায়দায় সংগ্রহ করা হত ;কারণ সেক্ষেত্রে রাজার পক্ষে শিলালিপি লেখার প্রয়োজন ঘটত না—এ সাবধানবাণী সাক্ষর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এক শ্রেণীর লোকের জন্য। এ থেকেই অনুমান করছি, রাজা-শ্রেষ্ঠী শ্রেণী এবং বলাবাহুল্য পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা এ প্রথার স্থায়িত্ব কামনা করলেও একটি বিরুদ্ধবাদী জনমত—নিঃসন্দেহে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজহিতৈষী দলের জনমত—ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল। আলবেরুণিও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গেছেন—"হিন্দুদের একাংশ এই মন্দির নর্তকীদের উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি।"

মাত্র গত শতাব্দীর কথা : ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ। য়ুরোপে তখন পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের

একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে জোসেফিন বাটলারের নেতৃত্বে। কেউ কেউ বলেছেন, সেই আন্দোলনের ঢেউই এসে পৌঁচেছিল ভারতবর্ষে—ইংরেজের উপনিবেশের এই দেশে। কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। জোসেফিন এলিজাবেথ রাসেল যে ব্যবস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন তা পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য নয়। ঐ বাঁকা পথে ইংলন্ডে, তথা য়ুরোপে সমুদ্রপথে যে ভয়াবহ দুটি রোগ অনুপ্রবেশ করছিল—গনোরিয়া ও সিফিলিস্, তার উচ্ছেদ হয়নি— হয়েছিল "Contagious Diseases Acts "which placed the loose women in seaports and military towns under police jurisdition, often subjecting them to much injustice."

ইংরেজ শাসনের সময়ে ভারতবর্ষে প্রসঙ্গটা প্রথম আসে ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। ভারত-সরকারকে ঐ সময় একটি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করতে হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল : পতিতাবৃত্তি। প্রসঙ্গত এল ইংরাজ উপনিবেশে পতিতাবৃত্তির কথা এবং সেই সূত্র ধরে এই অদ্বিতীয়া বারবণিতার প্রসঙ্গ : দেবদাসী। এ কৃতিত্ব হরি সিং গৌর-এর। তিনিই একটি মেমোরেন্ডাম পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় বৃটিশ সরকারকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলেন। তা বিবেচনা করতে সময় তো লাগবেই। দেখা গেল প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপিত হয়েছে ১৯১২ সনে, সেই যে বছর কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে দিল্লীতে স্থাপন করা হল। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পর-পর তিনখানি 'বিল' উত্থাপিত হল। তাদের জনক মানেকজী দাদাভাই, আম্বেলকার এবং মাড়্গে। সরকার জবাব দিলেন—দেবদাসী প্রথার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত বিশেষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়নের পূর্বে সে অঞ্চলের জনগণ কী চায় তা জানা দরকার। 'জনগণ' বলতে সে-আমলে বোঝাতো সে অঞ্চলের রাজা-মহারাজা-নবাব এবং তাদের ছত্রচ্ছায়ায় যাঁরা করে খাচ্ছেন। যাই হোক, এঁদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নিযুক্ত হল একটি কেন্দ্রীয় সিলেক্ট কমিটি। সেটা পরের বছর, ১৯১৩ সনে। সিলেক্ট কমিটি বিচার বিবেচনা করে তাঁদের মতামত জানালেন পরের বছর, মার্চ মাসে। কিন্তু তার সওয়া বছরের মধ্যে—ছাব্বিশে জুন ১৯১৪ তারিখে, সারাজেভোতে প্রিন্সেপ্-নামে একজন সার্বিয়ান ছাত্র বেমক্কা খুন করে বসল সস্ত্রীক অস্ট্রিয়ান আর্চ-ডিউক ফার্ডিনান্ডকে। ঘটনাটা অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তো? তা তো হবেই—বহু দশক পার হয়ে গেছে যে। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনা থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রাণ দিল—চার বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। ফলে, ভারত সরকারের জরুরী ফাইলের তলায় দেবদাসীর ভাগ্যবিজড়িত ঐ ফাইলটি চাপা পড়ে গেল।

শোনা যায়, একজন অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান ঐ সময় বলেছিলেন, আইন প্রণয়ন করে এ প্রথা রোধ করার আগে ভেবে দেখুন—ঐ দেবদাসীদের উদ্ধার করা হলে তাদের কোথায় আশ্রয় দেবেন—তারা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে?

এ প্রশ্নটি অনেকে নিশ্চয় ভেবেছিলেন;কিন্তু তার সমাধানের কোনও বাস্তব প্রচেষ্টা নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ১৯২২ সনে হরি সিং গৌড় বোম্বাই বিধানসভায় পুনরায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বোম্বাই বিধানসভার বেশ কিছু প্রভাবশালী সদস্য এজন্য হরি সিং গৌরকে ভর্ৎসনা করেন। এমনকি তাঁকে 'অহিন্দু' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়।

বছর পাঁচেক পরে দেখছি, কেন্দ্রীয় পরিষদে রামদাস পানতুলু উপস্থিত হয়েছেন একই জাতের প্রস্তাব নিয়ে।

দুটি প্রস্তাবই গৃহীত হল ;কিন্তু আইন পাশ হল না কোথাও।

ইতিমধ্যে (১৯২৭) সারদা-আইন পাস হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ কঠোরভাবে বলবৎ হওয়ায়, অভিভাবকরা আর আঠারো বছরের কমবয়সী মেয়েদের নিয়ে আসে না মন্দিরে, পুরোহিতের দলও বয়সের হিসাবটা খতিয়ে দেখে। যেন 'আঠারো বছর' বয়সটাই সব কিছুর শেষ কথা। নিঃসন্দেহে তা একটা বড় কথা। অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হল ;কিন্তু দেবদাসী-প্রথা বন্ধ হল না।

হরি সিং গৌর ছাড়া এ আন্দোলন নিয়ে কাজ করছিলেন মাদ্রাজের ডঃ মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী। মাদ্রাজ বিধানসভায় বস্তুত তিনিই প্রথম এই বিলটি উত্থাপন করে 'দেবদাসী-প্রথা' উচ্ছেদের দিকে একটি বড় জাতের পদক্ষেপ করেন। তারিখটা শুক্রবার, চৌঠা নভেম্বর উনিশ শ সাতাশ।

তাঁর প্রচেষ্টাতেই আন্দোলনটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। আনি বেসান্ত এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিরুদ্ধবাদীদের একটি 'চ্যালেঞ্জ থ্রো' করলেন সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে : "কেউ কি আমাকে দেখাতে পারেন হিন্দুর কোনও ধর্মশাস্ত্রে দেবদাসীর বিধান আছে?"

কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি।

ঐ সময় মহাত্মাজী দক্ষিণ ভারত প্রদক্ষিণ করেন। বিভিন্ন জনসভায় এবং সংবাদপত্রে তিনি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মিস্ মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া'কে ভারতবাসী মাত্রেই গালমন্দ করেন ;কিন্তু 'ডেভিল' কে যদি তার 'ডিউ' দিতে হয় তবে স্বীকার করতে হবে— ঐ গ্রন্থের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কিছু কাজ হয়েছিল। যাঁরা চাইছিলেন দেবদাসী প্রথা অব্যাহত থাক— সেই যাঁরা হরি সিং গৌরকে 'অহিন্দু' বলে গাল পেড়েছিলেন—এখন তাঁরা নীরব থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। কারণ মিস্ মেয়োর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্যতম লক্ষ : দেবদাসী প্রথা।

ডঃ মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী দীর্ঘদিন—বলতে গেলে প্রায় একাই—এই প্রথাটির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। বিশের দশক থেকে প্রায় পঞ্চাশের দশক। সমগ্র

দাক্ষিণাত্যে তিনি আন্দোলন চালান। জনসভায়, বিশেষ করে মন্দিরের প্রবেশ-পথে এ জাতীয় সভাসমিতিতে ক্রমে জনমত গড়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকায় নানান বিদগ্ধ লেখক তাঁর এ শুভ প্রচেষ্টায় মদত দিতে থাকেন। পুরোহিত, মন্দির-কর্তৃপক্ষ এবং তাদের পিছনে ছিলেন যে সব পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা ক্রমেই হাল ছেড়ে দিতে থাকেন। প্রথমে মহীশূর রাজ্যে, পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ সরকার বিপুল জনমতের চাপে দেবদাসী প্রথা রদ করার স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করেন। শ্রীমতী রেড্ডী সেদিন সানন্দে ঘোষণা করেন—'I am glad that this time-old Devdasi System in the Hindu temples as well as dedication of girls to Hindu idols have been totally abolished by two measures, Act No.V of 1929 and Prevention of Dedication Act of 1949." [আমি আজ আনন্দিত, কারণ দীর্ঘকালের দেবদাসী প্রথা এবং মন্দিরে হিন্দু মেয়েদের উৎসর্গ করার প্রথা আজ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হল।]

স্বাধীন ভারতসরকার তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডক্টর মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডিকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিতা করেন।

দেবদিন্ন তারপর থেকে আর মূর্তি গড়ে না; গড়ে বিমূর্ত বিমূর্তি।

আর সুতনুকা?

ঠিক জানি না, শুনেছি—তারা মন্দিরের ঘৃতপ্রদীপজ্বলা আধো-অন্ধকারের রহস্য থেকে মুক্তি পেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতের বড় বড় শহরের লালবাতিজ্বালা চাকলাগুলিতে। কোন কোন সৌভাগ্যবতী অবশ্য সাগারপারে ইরান-তুরান অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। আবুধাবি, দুবাই বা ঐ জাতীয় তৈলাক্ত অঞ্চলে।

এটাও ঠিক জানি না, আন্দাজ করি নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার মতো আরব শেখেরাও হয়তো তাদের সর্বাঙ্গ মুড়ে দিয়েছে ঝুটো হীরে-মণি-মুক্তায়। শেখ-হারেমে হয়তো তারা নতুন করে ঝুটো-'অলঙ্কারা' হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ।।

1 (পৃঃ ৯) ....*The Wonder That was India*, Dr, A.L.Basham, Sidgawick & Jackson, London 1954, p.185

2 (পৃঃ ১১)....*কামসূত্র*, বাৎস্যায়ন, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোক

3 (পৃঃ ১২)....Prostitution, *Encyclopedia Britannica*

4 (পৃঃ ১২)....Prostitution, *Oxford English Dictionary*

5 (পৃঃ ১৩)....*Herodotus*, Bk. I, p. 199

6 (পৃঃ ১৩)....Socrates, *Ecclesiastical History*, Bk. XVIII

7 (পৃঃ ১৩)....Sozomon, *Eccles. Hist Bk.* V. p.10

8 (পৃঃ ১৩)....*Geography*, Strabo, vol.II, pp. 14-16

9 (পৃঃ ১৪)....'*সেতু*', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

10 (পৃঃ ১৪)....*The City of Gods*, St.Augustine, Bk. IV, p.10

11 (পৃঃ ১৫)....op, cit, Basham

12 (পৃঃ ১৬)....Salmon Reinach

13 (পৃঃ ১৭)....*The Malayasians of British Guiana*, by Selignman, Cam. Univ. Press, 1910, p.473

14 (পৃঃ ১৭)....*The Origin of the Faminy, Private Property and the State, Engels, F .*, Progress Publishers, Moscow, 1948, p, 52

15 (পৃঃ ১৭)....*The Stew and the Strumpets*, Henriques

16 (পৃঃ ১৭)....*op.cit*, Engels, p.51

17 (পৃঃ ১৯)....Ibid, p. 58

18 (পৃঃ ২২)....'জয়দেব', *অভিধান*, সুবলচন্দ্র মিত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।।

1 (পৃঃ ২৪)....মেঘদূতে-বর্ণিত বিদিশা-নগরীর অনতিদূরে বর্তমান 'সাঁচী'র নাম মৌর্যযুগে ছিল 'কাকনায়', *Sanchi*, The Publications Divn, Govt. of India Jan '60, p.5.

2 (পৃঃ ২৪) ...বুদ্ধদেবের '2500–বর্ষ পূর্তি উৎসবে'র প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মহাথেরের ভাষণ অনুসারে সাঁচীর বৃহত্তম-স্তূপে রক্ষিত আছে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের পূতাস্থি, যা মগধরাজ বিম্বিসার কুশীনগর থেকে সংগ্রহ করে এনে প্রথমে নিজ রাজধানীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সম্রাট অশোক স্বয়ং সেটি সাঁচীতে স্থানান্তরিত করেন।

3 (পৃ. ২৪) ...এই শ্লোকটি সাঁচীস্তূপের পূর্বতোরণে আজও দেখতে পাওয়া যায় অর্থঃ 'বিদিশানগরীর দক্ষ কারিগর দ্বারা কৃত।'

4 (পৃ. ২৮) ..."এখন তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তুমি মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীত, পথে তোমার কোনও বিশ্রামস্থল নাই, এবং পথ-চলাকালে তুমি কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও করোনি....." *ধম্মপদ* ২৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।।

1 (পৃঃ ৩৬) ... *'শ্যামা'*—রবীন্দ্রনাথ, মহাবস্তুবদান জাতক

2 (পৃঃ ৩৭) ... *'অভিসার'*, রবীন্দ্রনাথ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।।

1 (পৃঃ ৪৫) ...তাও-চিঙ্ ঐতিহাসিক চরিত্র। ফা-হিয়েন-এর সঙ্গে ভারত পরিক্রমায় আসেন। প্রাকসন্ন্যাস জীবনে তিনি অধ্যাপক ছিলেন।

2 (পৃঃ ৪৬) ...আর্যভট্ট—অনেকের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের পূর্বযুগের বৈজ্ঞানিক। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁকে 'নবরত্নের' অন্যতম হিসাবে কালিদাসের বন্ধু বলে ধরা হয়েছে।

3 (পৃঃ ৪৬) ..."নৃতগীতরত রমণীকুলের আকর্ষণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করব"—*ধম্মপদ*

4 (পৃঃ ৪৬) ...ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণ কাহিনীতে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত প্রখ্যাত তুন্‌হুয়ান সঙ্ঘারামে বিশ্রামগ্রহণের প্রসঙ্গ আছে।

5 (পৃঃ ৪৬) ...'লাজহরণ' নৃত্য এবং 'কালবৈশাখী'-র নির্দেশরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তা ঔপন্যাসিক-সত্য মাত্র। এমন কোনও প্রথা বা উৎসবের কথা আমি কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শনে পাইনি। তবে এ-জাতীয় উৎসব ধর্মের মোড়কে দর্শকদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা অবান্তর না-ও হতে পারে।

6 (পৃঃ ৪৬) ...ভুবনেশ্বরে 'লিঙ্গরাজ' মন্দিরের গাইড পাণ্ডা আমাকে বলেছিলেন—দীপান্বিতার রাত্রে প্রতি বৎসর মন্দিরের এক বেতনভুক অন্ধ বৃদ্ধ মন্দিরশীর্ষে উঠে যায় এবং 'কলস'-এর উপর একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে। অপর একজন পাণ্ডাও এ-কথার সমর্থন করেছিলেন। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী যদি এই তথ্যের সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

7 (পৃঃ ৪৮) ...*মেঘদূত*, উত্তরমেঘ, শ্লোক—৫৪

8 (পৃঃ ৫১) ...চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে, ৪৫ পৃষ্ঠায় যে যক্ষিণী-মূর্তি'র স্কেচ দেওয়া হয়েছে, —যার ব্যাখ্যা এই অনুচ্ছেদে দেওয়া হল—সেটি মথুরা-শৈলীর, দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে নির্মিত—কালিদাসের সমকালে নয়—এটি কাহিনীকারের সজ্ঞান 'অ্যানাক্রনিজম'।